নাচের
পুতুল ২
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

নাচের পুতুল (২)-৭৭

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

আমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ায় বনহুর—অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, দস্যুরাণী কুহেলি পর্বত থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে!

সর্দার, বড় আশ্চর্য এ ঘটনা! কুহেলি পর্বত সে তো অতি ভয়ঙ্কর দুর্গম স্থান।

রহমান, শুধু দুর্গম স্থান নয়— সে গুহায় দস্যুরাণীকে বন্দী করে রেখেছিলাম সাধ্য নেই তার বেরিয়ে আসে, কিন্তু......বনহুর চিন্তিতভাবে পুনরায় চিঠিখানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। চিঠিখানা বারবার পড়লো বনহুর, তারপর বললো—আমার মনে হয় মিঃ আহাদ চৌধুরী তাকে মুক্ত করেছেন।

সর্দার, মিঃ আহাদ চৌধুরী কি করে জানলেন যে, দস্যুরাণী কুঁহেলি পর্বতে আটক আছে? এবার বললো রামসিং।

বনহুর বললো—ভাগ্য মানুষকে টেনে আনে রামসিং। মিঃ আহাদ চৌধুরী এবং আরও দুই ব্যক্তি কোনোক্রমে জংলীদের হাতে বন্দী হন। জংলীরা এই তিনজনকে নিয়ে যায় কুহেলি পর্বতের সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কুহেলিকায়। ঐ বিস্ময়কর শৃঙ্গের একটি গুহায় আটক করে রাখে তারা ঐ তিন ব্যক্তিকে।

সর্দার, বিস্ময়কর ঘটনা তো! বললো রহমান।

বনহুর বললো—হাঁ, বিস্ময়করই বটে।

কিন্তু সেই কুহেলিকা শৃঙ্গ থেকে কিভাবে উদ্ধার পেলেন আহাদ চৌধুরী বলুন সর্দার?

দস্যুরাণী যে গুহায় আটক ছিলো, সেই গুহায় একটি ছিদ্রপথ ছিলো। ঐ ছিদ্রপথে দস্যুরাণী দেখতে পেয়েছিল আহাদ চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গী তিনজনকে যখন জংলীরা বেঁধে নিয়ে যায়।

সর্দার, তারপর?

দস্যুরাণী আমাকে বলছিলো? কিভাবে মিঃ চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গী দু'জনকে হাত পিছমোড়া অবস্থায় বেঁধে জংলীরা কুহেলিকা শৃঙ্গের দিকে নিয়ে গিয়েছিলো। আমাকে সে অনুরোধ জানিয়েছিলো তাদের উদ্ধার করার জন্য। আমি তখন তার কাছে স্বীকার করিনি তাদের উদ্ধার করবো বলে কিন্তু আমি পারলাম না কঠিন হতে, কারণ মিঃ আহাদ চৌধুরী শুধু মানুষ হিসেবে ভাল নন, তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ। ভদ্রলোক যদিও আমাকে খুঁজে ফিরছেন এবং সুযোগ পেলে তিনি আমাকে কঠিন শাস্তি দিতেও কসুর করবেন না তবু আমি তাঁকে কুহেলিকা শৃঙ্গের দুর্গম গহবর থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

বলেন কি সর্দার!

হাঁ রহমান, কুহেলিকা শৃঙ্গের গহ্বর থেকে তাদের তিনজনকেই আমি পৃথিবীর বুকে তুলে নিয়েছিলাম। সেজন্য আমাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। কুহেলি পর্বতের গায়ে বিরাট লতাগুল্ম ঝুলছিলো, আমি সেই লতার দড়ি বানিয়ে তাদেরকে তুলে আনি পৃথিবীর বুকে।

মিঃ চৌধুরী আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য একদিন উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো আর আপনি তাকে......

একদিন নয় রহমান, আজও তিনি আমাকে সন্ধান করে ফিরছেন। পূর্বেই বলেছি মিঃ চৌধুরী আমাকে সায়েস্তা করার জন্য আজও উন্মুখ......

সর্দার, তবু আপনি......

হাঁ, কারণ মিঃ চৌধুরী একজন......

প্রখ্যাত ডিটেকটিভ, এইতো সর্দার?

শুধু তাই নন, তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি। দেশের এবং দশের মঙ্গল সাধনই তাঁর উদ্দেশ্য, তাই আমি তাঁকে মৃত্যুগহ্বর থেকে উদ্ধার করে এনেছি।

সর্দার, মিঃ চৌধুরী আপনাকে চিনতে পারলেন না বা চিনতে পেরে কিছু বললেন না?

সে সুযোগ আমি তাঁদের দিইনি রহমান। আমি তখন সম্পূর্ণ জংলী বেশে ছিলাম এবং সন্ধ্যার অন্ধকার তখন সমস্ত পৃথিবীকে ঝাপসা করে তুলেছিলো, তাই তাঁরা আমাকে ঠিক চিনতে পারেনি। বিশেষ করে মিঃ চৌধুরী আমাকে দিনের আলোতে দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারতেন।

সর্দার, আপনার কি মনে হয় দস্যুরাণীকে মিঃ চৌধুরীই উদ্ধার করেছেন?

হাঁ, তাছাড়া কারও সাধ্য ছিলো না দস্যুরাণীর সেই গুহা খুঁজে বের করে। রহমান, রামসিং তোমরা জানো না মিঃ আহাদ চৌধুরী কত বুদ্ধিমান এবং কত শক্তিমান!

আপনি তাকে সমীহ করেন সর্দার?

ঠিক সমীহ নয়, মনে মনে শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু কেন জানো? পৃথিবীতে এমন ব্যক্তির নিতান্ত প্রয়োজন আছে তাই।

বনহুর কথাটা শেষ করতে করতে আসন গ্রহণ করলো। আংগুলের ফাঁকে চিঠিখানা তখনও ধরা আছে। বাম হাতের মুঠায় দস্যুরাণীর নিক্ষিপ্ত ছোরাখানা। বনহুর এবার ছোরাখানা উল্টে-পাল্টে দেখে বললো—দস্যুরাণী মুক্তি পাবার পর তার আস্তানায় গিয়েছিলো এবং সেখান থেকেই সে আমার জম্বু আস্তানায় এসেছে কিন্তু বড় আশ্চর্য, কি করে সে জম্বু আস্তানার সন্ধান পেলো? আমি তাকে ক্ষমা করবো না, কারণ সে আমার বিনা অনুমতিতে আমার আস্তানায় প্রবেশ করেছে।

সর্দার, কে সেই দস্যুরাণী যার স্পর্ধা এতখানি, যে আপনার আস্তানায় প্রবেশ করার সাহস পায়?

রামসিং রায়হান জঙ্গলের রাণী সেই দস্যুরাণী। আমাকে সে বন্দী করেছিলো।

সর্দার, শুনেছিলাম দস্যুরাণী আপনাকে তার পাতালপুরীর গহ্বরে দুর্গম কারাকক্ষে বন্দী করে রেখেছিলো?

হাঁ, সত্য কথা।

সর্দার, বেয়াদবি মাফ করবেন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো?

করো, আমি তার জবাব দেবো।

সেই পাতালপুরীর অন্ধ কারাকক্ষ থেকে......

কি করে বেরিয়ে এলাম জানতে চাও?

হাঁ সর্দার।

দস্যু বনহুরকে বন্দী করে দস্যুরাণী আস্তানায় একটি আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছিলো। সে কি মহা আনন্দ উৎসব! দস্যুরাণীর অনুচরবৃন্দ সবাই খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। যে যেখানে পারে ফূর্তি করে চলেছে। যারা আমার পাতালপুরীর কারাকক্ষ পাহারা দিচ্ছিলো তারাও শরাব পান করে আত্নহারা হয়ে উঠেছে। আমি সেই সুযোগকে অবহেলা করতে পারলাম না। কারাকক্ষের লৌহশিকের ফাঁক দিয়ে একজন প্রহরীর হাত ধরে টেনে নিলাম কাছে। প্রহরী প্রায় সংজ্ঞাহীনের মত আমাকে বললো, কি চাও তুমি? আমি বললাম, তোমাদের সঙ্গে আমাকেও একটু আনন্দ করতে দাও বন্ধু। লোকটা বললো, সত্যি, তুমিও আমাদের সঙ্গে আনন্দ করতে চাও? বললাম, হাঁ বন্ধু, যদি দয়া করে আমাকেও বের করে নাও তোমাদের দলে তাহলে খুব খুশি হই। প্রহরী বললো, যদি পালিয়ে যাও? নাক-কান মলে বললাম, আরে ছিঃ ছিঃ কি যে বলো পালাবো, আমি কি এত বোকা তোমাদের এমন আনন্দ উৎসব ছেড়ে যেতে পারি!

রহমান এবং রামসিং হাসছিলো মাথা নিচু করে। বনহুর বলে চলেছে, আমি জানতাম, একেই তো ওরা কত বুদ্ধিমান তারপর নেশা করেছে চরমভাবে। তবু একজন বললো, না না হবে না, কিছুতেই লৌহফটক খুলে তোমাকে বের করে আনা হবে না। আমি বললাম, বন্ধু, আমাকে তোমারা বিশ্বাস করতে পারছো না? বেশ, তাহলে তোমরাই এসো এই কারাকক্ষে। ওরা নিজেরাই তখন বলাবলি শুরু করলো, হাঁ সেই ভালো, ও বেচারীর যখন এত সখ তখন আমরাই চলো কারাকক্ষের ভিতরে যাই—তাহলে ওর আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়াও হবে, পালাতেও পারবে না।

সবাই মিলে যুক্তি করে কারাকক্ষের লৌহদরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো। অবশ্য চাবি তাদের কাছে ছিলো না, চাবি ছিলো প্রহরীর কাছে।

প্রধান প্রহরী বেচারীও ছিলো শরাব পানে অচেতন, তাই চাবি সংগ্রহ করতে বেগ পায়নি ওরা।

আমার হাতে-পায়ে ছিলো লৌহশিকলের বেষ্টনী। কৌশলে তাও মুক্ত করে নিলাম শরাব পানে প্রায় সংজ্ঞাহীন প্রহরীদের দ্বারা। তারপর বুঝতেই পারছো, ওরা তো অন্ধ কারাকক্ষে আনন্দ করছে, আমি সেই সুযোগে বেরিয়ে এলাম......

সর্দার, বহুদিন থেকে আমাদের মনে এ প্রশ্ন উঁকি দিয়েছিলো দস্যুরাণীর লৌহ কারাকক্ষ থেকে কি করে বেরিয়ে এসেছিলেন। আপনি তো যাদুকর নন, তাই আজ সব প্রশ্নের সমাধান হলো।

বনহুর বললো—রহমান, রামসিং, জানি আমার অনুচররা অতি বুদ্ধিমান তবু সব সময় আশঙ্কা হয় না জানি কোনো মুহূর্তে দস্যুরাণীর অনুচরদের মত তারাও ভুল করে না বসে। অনুচরদের ভুলের জন্যই অনেক সময় বিপদ ঘনিয়ে আসে, বুঝলে?

জানি এবং বুঝি সর্দার, কারণ অনুচরদের মধ্যে অনেকেই আছে সরল, সহজ এবং সাদাসিধা—তাদের মাথায় বুদ্ধি কম।

হাঁ, তেমনি দস্যুরাণীর অনেক অনুচর আছে যাদের মাথায় শুধু গোবর ছাড়া কিছু নেই। রহমান, রামসিং!

বলুন সর্দার?

আজ রাতে আমি আব্বাস হাজারীর সঙ্গে দেখা করবো এবং নৎসার গুদামের চাল কেন লোকচক্ষুর অন্তরালে নদীবক্ষে বিসর্জন দিলো জানতে চাইবো। যদি সুষ্ঠু জবাব দিতে না পারে তাকে তুলে নিয়ে আসবো জম্বু আস্তানায়। আব্বাস হাজারীকে আটক করে হাজারী টিমকে নাচাবো এবার।

কি করতে হবে আদেশ করুন সর্দার?

আব্বাস, সেই হাজারীর বাড়ির অনতিদূরে একটি মেহগনি গাছ আছে। গাছের তলায় কান্ডের আড়ালে একটি গাড়ি রাখবে—ব্যাস আর কিছু করতে হবে না তোমাদের।

তাজকে নিয়েই আপনি সেখানে যাবেন?

হাঁ রহমান, তাজকে নিয়েই যাবো।

দস্যুরাণী?

হাঁ, দস্যুরাণী কুহেলি পর্বতের গোপন গুহা থেকে পালিয়েছে কিন্তু আমার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না। আমি বেজি দিয়ে সাপ খেলা দেখাবো। রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আমার চাই। আরও একটা কথা, দস্যুরাণী আমার জম্বু আস্তানার প্রবেশপথ চিনে নিয়েছে, কাজেই এ পথ রুদ্ধ করে অন্য পথ তৈরি করতে হবে যে পথের সন্ধান দস্যুরাণী কেন, কেউ জানবে না।

সর্দার, বিস্ময়কর ব্যাপার দস্যুরাণী কি করে জানলো আপনি জম্বু আস্তানায় আছেন এবং আস্তানার প্রবেশপথই বা সে কি করে খুঁজে বের করলো?

হাঁ, দস্যুরাণী অত্যন্ত সুচতুর নারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বহুদিন আমি এই দস্যুরাণীর নাম শুনে এসেছিলাম, অদ্ভুত এক নারী সে!

❑

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দস্যুরাণী।

চন্দনা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। কক্ষমধ্যে অপর কোনো ব্যক্তি নেই—শুধু ওরা দু'জন।

দস্যুরাণী হাসি থামিয়ে বলে—চন্দনা, দস্যু বনহুর আমাকে বন্দী করে রেখেছিলো কুহেলি পর্বতের এক দুর্গম গুহায়— যেখানে মানুষের গমনাগমন অসাধ্য।

রাণী, তুমি কি করে সেই গমনাগমনে অসাধ্য স্থান থেকে বেরিয়ে এলে?

ও, তুই জানিস্ না আমি কি করে এসেছি, না?

রাণী, আমি কিছু জানি না। তবে শুনেছি কেউ তোমাকে উদ্ধার ব্যাপারে সহায়তা করেছিলো।

ঠিক তাই এবং যে ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার করেছেন তিনি হলেন মিঃ চৌধুরী।

রাণী!

হাঁ চন্দনা।

মিঃ চৌধুরী—মিঃ আহাদ চৌধুরী তোমাকে উদ্ধার করেছেন? তিনি—তিনি কি করে জানলে তুমি কুহেলি পর্বতের কোনো গুহায় আটক আছো?

মিঃ চৌধুরী আমাকে সব কথা বলেছেন তিনি কি করে সন্ধান পেলেন এবং আমাকে উদ্ধার করলেন।

রাণী, তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে যদি বলতে খুব খুশি হতাম।

তোকে না বলে কি পারি চন্দনা!

বলো?

কতদিন পর তাঁকে দেখলাম! সত্যি তাঁকে এমন অবস্থায় এমনভাবে দেখবো ভাবতে পারিনি। খোদাকে আমি হাজার হাজার বার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাণী, সবই তো সেই দয়াময়ের ইচ্ছা, তিনি মানুষকে যেভাবে চালান সেইভাবে চলে।

না।

মানে?

মানে দয়াময় মানুষকে চালান না।

বলো কি রাণী! তুমি দিন দিন নাস্তিক হয়ে যাচ্ছো?

চন্দনা, আমি নাস্তিক নই, যা সত্য তাই বলছি। দয়াময় মানুষকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। মানুষকে ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা দিয়েছেন। কোন্ কাজ ভাল কোন্ কাজ মন্দ মানুষ যেমন বোঝে তেমন করে পৃথিবীর কোনো জীব বোঝে না। দয়াময় মানুষকে বিবেক বলে

একটা জিনিস দিয়েছেন, মানুষ সেই বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়। নিজেদের ভালমন্দ পথ বেছে নেবার ক্ষমতা তাদের আছে। কাজেই মানুষ বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যে যেমন কাজ করবে তেমনি সে তার ফল ভোগ করবে বা করে থাকে।

তা বুঝলাম, বলো এবার মিঃ চৌধুরী কিভাবে তোমার সন্ধান পেলেন এবং তোমাকে কিভাবে উদ্ধার করলেন?

হাঁ, সে কথাই বলছি চন্দনা। মিঃ চৌধুরী, রহমত এবং তাঁদের পরিচিত কোনো এক লোককে কয়েকজন জংলী......

রাণী, কি করে রহমত, মিঃ চৌধুরী এবং তাঁদের সঙ্গী ভদ্রলোক জংলীদের কবলে পড়েছিলেন, এ কথা আমি রহমতের মুখে শুনেছি। আমি শুনতে চাই তারপর থেকে......

বেশ, তাই তবে শোন্।

বলো?

জংলী প্রহরীদের একজন লতার দড়ি নামিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিয়েছিলো।

হাঁ, তাও শুনেছি।

তবে কি শুনতে চাস্ চন্দনা? হেসে বললো দস্যুরাণী।

শুনতে চাই তোমার উদ্ধারের কথা।

কিন্তু কিছুটা আগে থেকে না বললে ঠিক বুঝতে পারবি না।

তবে বলো?

জংলী প্রহরী তাদের উদ্ধার করে ইংগিতে পর্বত থেকে নেমে যেতে বলে সে অন্য পথে চলে গেলো। জংলী হলেও সে একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাঁ রাণী, ঐ রকমই বলেছিলো রহমত আমার কাছে। জংলীদের মধ্যেও রয়েছে দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা, রয়েছে একটি মহৎ প্রাণ। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে থামলো চন্দনা।

দস্যুরাণী একটি আসনে বসে দেহটা সে আসনে এলিয়ে দিলো, তারপর বলতে শুরু করলো—মিঃ আহাদ চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গী দু'জনকে উপর থেকে নিচে নেমে যাওয়ার ঢালু পথ দেখিয়ে দিয়েছিলো জংলীটি, তারপর সে চলে গিয়েছিলো। মিঃ চৌধুরী তাঁর সঙ্গীদ্বয় সহ যখন পর্বতের নিচে নেমে এসেছিলেন তখন তাঁদের কানে ভেসে এসেছিলো একটি অশ্বপদশব্দ। নির্জন পর্বতমালার পাদদেশে অশ্ব-পদশব্দ এলো কোথা থেকে...মিঃ চৌধুরী ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কয়েক মাইল আসার পর হঠাৎ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, দেখতে পেয়েছিলেন তাঁরা পাথুরিয়া মাটির উপর পড়ে আছে একটি সিগারেটের টুকরা। হাঁ আরও একটি কথা, মিঃ চৌধুরী আমাকে বলেছেন তারা পর্বতের নিচে নেমেই দেখতে পেয়েছিলেন অশ্ব-পদচিহ্ন। সেই অশ্বপদচিহ্ন লক্ষ্য করেই তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু যেখানে গিয়ে তাঁরা সিগারেটের টুকরাটা পেয়েছিলেন সেখানে অশ্বপদচিহ্ন ঘন ছিলো। নিশ্চয়ই অশ্বরোহী সেখানে অশ্ব ত্যাগ করে সিগারেট পান করেছিলো। তারপর সে গন্তব্য স্থানে চলে গিয়েছিলো। মিঃ চৌধুরী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, তিনি সিগারেটের টুকরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন ঐ সিগারেটটি মূল্যবান সিগারেট তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মিঃ চৌধুরী সিগারেটের টুকরাটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখেছিলেন। তারপর পুনরায় তিনি চলতে শুরু করেন। ব্যাকুল হয়ে উঠেন তাঁরা সামান্য খাদ্য এবং পানির জন্য। কারণ কয়েকদিন হলো তাঁরা সম্পূর্ণ উপবাসী ছিলো। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, কয়েক মাইল এগুবার পর তারা একটি সরাইখানা দেখতে পেলেন।

সরাইখানায় এসে আশ্রয় নিলেন ওরা তিনজন। মিঃ আহাদ চৌধুরী সব কথা সরাইখানার মালিককে খুলে বললেন, কিভাবে জংলীরা তাঁদের জাহাজে আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের সবাইকে হত্যা করে মাত্র তিনজনকে তারা ধরে এনেছিলো।

সরাইখানার মালিক বাংলা বা ইংরেজি বুঝতে না পারায় ফরাসি ভাষায় তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন বলে তিনি আমাকে জানান।

কিছু সময়ের মধ্যেই সরাইখানার মালিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে গিয়েছিলো মিঃ আহাদ চৌধুরী, রহমত এবং তাদের বন্ধু ইউসুফ আলীর।

সরাইখানার মালিক তাঁদের সঙ্গে মহৎ ব্যবহার করেন এবং যতক্ষণ তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ না হন ততক্ষণ তাঁদের হোটেলে আশ্রয় দেন।

মিঃ চৌধুরী কিছুটা সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পকেট থেকে সিগারেটের টুকরাটা বের করে নেন এবং পরীক্ষা করে দেখতে থাকেন। তাঁর মাথায় কি মতলব খেলছিলো তিনিই জানেন। তিনি এক সময় কাউকে কিছু না জানিয়ে সরে পড়েন সরাইখানা থেকে। রহমত এবং তাদের বন্ধু ইউসুফ আলী সাহেব আর খুঁজে পান না মিঃ চৌধুরীকে।

মিঃ চৌধুরী পুনরায় ফিরে আসেন কুহেলি পর্বতে। তাঁর মনে নাকি সন্দেহ জাগে নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর রাণীকে এই পর্বতের কোনো গুহায় বন্দী করে রেখেছে। এই সন্দেহ তাঁকে টেনে নিয়ে যায় সেখানে। সন্ধান করে ফেলেন তিনি পর্বতের নানা স্থানে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটি কালো রুমাল। রুমালখানা আমার হাত থেকেই পড়ে গিয়েছিলো, যখন দস্যু বনহুর আমাকে কুহেলি পর্বতে টেনে তুলে আনছিলো। রুমালখানা দেখে মিঃ চৌধুরীর মনে আশার সঞ্চার হয়, তিনি বিপুল আগ্রহে এগুতে থাকেন কারণ তাঁর সন্দেহ সত্য তাতে কোনো ভুল নেই তিনি বুঝতে পারেন।

মনে যাঁর অসীম আগ্রহ খোদা বুঝি তাঁর সহায় হন। মিঃ চৌধুরী এক সময় খুঁজে পেলেন আমাকে যে গুহায় বন্দী করে রাখা হয়েছে সেই গুহা। কারণ, গুহামুখেই তিনি পূর্বের ন্যায় আরও একটি সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পান।

মিঃ চৌধুরীর পকেটে তখনও পূর্বের সেই সিগারেটের টুকরোটা ছিলো, তিনি দুটো টুকরো বের করে মিলিয়ে দেখেন একই কোম্পানীর সিগারেট এ দুটো তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

তিনি বুঝতে পারেন সেই অদ্ভুত গুহামধ্যেই আছে তাঁর রাণী ......বলে একটু হাসলো চন্দনা।

দস্যুরাণী বললো—হাঁ, তাঁর ধারণা হলো ঐ পাথরখানার ওপাশেই আছি আমি। তিনি তখন নানাভাবে পাথরখানা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন।

চন্দনা আগ্রভরা কণ্ঠে বললো—বলো তারপর কি হলো রাণী?

বলছি তো, সব কিছু বলছি।

বলো, সত্যি বড় শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার।

দস্যুরাণী বলে চলে—হঠাৎ পাথরখানার এক জায়গায় নজর পড়তেই মিঃ আহাদের চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো, তিনি দেখলেন পাথরের ঠিক মাথার উপরে একটি ছোট্ট ছিদ্র রয়েছে। মিঃ আহাদ বুঝতে পারলেন সুচতুর দস্যু বনহুর গুহামুখের পাথর সরিয়ে ফেলা সুকৌশল চাবিকাঠি পাথখণ্ডের ঠিক মাথার উপর রেখেছে যাতে সহসা কারও চোখে না পড়ে। মিঃ চৌধুরী ছিদ্রপথে অংগুলি প্রবেশ করে চাপ দিতেই পাথরখানা সরে গেলো। মুহূর্তে পৃথিবীর আলো আর বাতাস প্রবেশ করলো সেই গুহার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে গুহামধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি যাকে আমি মনে প্রাণে কামনা করছিলাম।

তারপর......তারপর রাণী?

আমি চমকে উঠেছিলাম, কারণ কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দুর্গম এ পর্বতে মিঃ চৌধুরী এলেন কি করে? পরক্ষণেই মনে পড়লো, তাঁকে জংলীরা বন্দী করে এনেছিলো আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাই বুঝতে পারলাম তিনি যেমন করে হোক জংলীদের কবল থেকে পালিয়ে এসেছেন। চন্দনা, এবার বুঝতেই পারছিস্ কি করে আমি সেই দুর্গম কুহেলি পর্বতের গোপন গুহা থেকে উদ্ধার পেলাম।

সত্যি, অপূর্ব অদ্ভুত তোমার এ মুক্তি রাণী।

হাঁ, আমিও তাই মনে করি।

কিন্তু তোমার আহাদ চৌধুরী তিনি এখন কোথায়? তাঁকে তুমি ছেড়ে দিলে রাণী?

তাঁকে ধরে রাখার সামর্থ্য আমার নেই, তিনি যে সবার জন্য। জানিস্, ঝাম শহরে একটি হত্যা রহস্য নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন।

কাজেই তাঁকে তুমি মুক্তি দিয়েছো, এই তো?

না দিয়ে উপায় ছিলো না! দস্যুরাণী কিছুটা আনমনা হয়ে যায়।

চন্দনা হেসে বলে—থাক এখন মিঃ চৌধুরীর কথা ভেবে নিজকে হারিয়ে ফেলো না রাণী। এবার বলো তো, দস্যু বনহুরের জম্বু আস্তানার সন্ধান তুমি কি করে পেলে?

সব কথাই বুঝি তোকে বলতে হবে?

কোন কথাই বা আমাকে বলা তুমি বাকি রেখেছো বলো? তোমার সব কথাই তো আমার জানা আছে।

অনেক চেষ্টা আর সাধনার ফলে দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান আমি পেয়েছি। অবশ্য আমার অনুমানের উপর নির্ভর করেই আমি অগ্রসর হয়েছিলাম। যাক, সব কথা তোর শুনে কাজ নেই। তবে মনে রাখিস্ চন্দনা, তোর রাণীর অসাধ্য কিছু নেই...কথাটা বলে উঠে দাঁড়ালো দস্যুরাণী।

চন্দনা বললো—তুমি এখন কোথায় যাবে?

আমাকে বিশেষ কোনো কারণে রায়হান আস্তানায় যেতে হচ্ছে। আমার উড়ন্ত সসার কি আস্তানায় আছে?

আছে রাণী কিন্তু......

বল্ কিন্তু কি?

তোমার এখন শরীর ভাল নয়। কুহেলি পর্বতের অদ্ভুত গুহায় বন্দী থেকে চেহারাটা তোমার কি হয়েছে বলোতো?

জানি, কিন্তু উপায় নেই। হাঁ, দস্যু বনহুর আমাকে আটক রেখে আমার কাছ হতে রক্তে আঁকা ম্যাপখানা আদায় করে নিতে চায়......হেসে উঠে দস্যুরাণী, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—রক্তে আকা ম্যাপ সে কোনোদিনই পাবে না। চন্দনা, আমি রায়হান আস্তানায় যাচ্ছি শুধু রক্তে আঁকা ম্যাপখানা নিয়ে আসার জন্য।

হাঁ রাণী, ওটা এখন মন্থনা আস্তানাতেই রাখা শ্রেয়, কারণ আজকাল তোমাকে মন্থনাতেই বেশি সময় কাটাতে হচ্ছে।

ঐ কারণেই আমি আজই রওয়ানা দেবো।

❑

অকস্মাৎ আর্তনাদ করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন আব্বাস হাজারী। তাঁর সম্মুখে জমকালো পোশাক পরা এক অদ্ভুত মূর্তি, দক্ষিণ হস্তে রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও আব্বাস হাজারী জমকালো মূর্তির মুখ সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন না তবু তিনি অনুমানে বুঝে নিলেন কে সে জমকালো মূর্তি।

আব্বাস হাজারী ঢোক গিলে ভালোভাবে তাকালেন জমকালো মূর্তির মুখের দিকে। ঐ চোখ দুটো যেন তাঁর নিতান্ত পরিচিত বলে মনে হলো। ঐ চোখ দুটোর দৃষ্টি তাঁকে যেন গ্রাস করে ফেলবে বলে মনে হলো তাঁর।

আব্বাস সাহেব অস্ফুট উচ্চারণ করলেন—এ্যাঁ, আপনি......

হাঁ আমি......

কি —কি চান আপনি?

এসেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

কিন্তু কেন— কেন?

বনহুরের রিভলভারের মুখ এসে ঠেকলো আব্বাস হাজারীর বুকে। শিউরে উঠলেন তিনি। মুখমন্ডল তাঁর মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। বনহুরের চোখ থেকে দৃষ্টি তাঁর নেমে এলো নিজের বুকে রিভলভারের আগায়। বুকের ভিতরে তখন তাঁর হাতুড়ির ঘা পড়ছে, চোখ দুটো গোলাকার হয়ে উঠেছে।

বললো বনহুর—হাজারী সাহেব, আপনাকে আমি কি বলে দিয়েছিলাম? কি শপথ করে এসেছিলেন আপনি সব ভুলে গেছেন?

এ্যাঁ...এ্যাঁ কি বললেন? আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।

সত্যি আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? বড় আফসোস, ...এই নিন এবার তো চিনতে পারছেন? বনহুর মুখের নিচের অংশ থেকে জমকালো কাপড়খানা সরিয়ে ফেললো।

আব্বাস হাজারী যদিও পূর্বেই চিনতে পেরেছিলেন তবু খানিকটা না বোঝার অভিনয় করছিলেন। এবার ঢোক গিলে বললেন—তুমি, মানে আপনি—

হাঁ, এতক্ষণে বুঝি হুশ হলো আপনার! বনহুর বাম হাতের মুঠায় চেপে ধরলো আব্বাস হাজারীর জামার কলার—হাজারী সাহেব, বলুন নৎসার এক গুদাম চাল কোথায় গেলো? ঝাঁকুনি দিলো বনহুর ভীষণভাবে।

আব্বাস হাজারী ভয়ার্তভাবে তাকাতে লাগলেন এদিক ওদিক হয়তো বা তাঁর কোনো আত্নীয় বন্ধুবান্ধবের অন্বেষণ করছেন। হঠাৎ যদি কেউ এই মুহূর্তে এসে পড়ে তাহলে জীবনটা অন্ততপক্ষে রক্ষা পেতো কিন্তু সব আশা তার দুরাশা মাত্র কারণ বনহুর তেমন কাঁচা মানুষ নয় যে তার আগমনবার্তা জানতে পারবে কেউ। তাছাড়া বনহুর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে হাজারী সাহেবের কক্ষে।

আব্বাস হাজারীকে এদিকে ওদিকে তাকাতে দেখে হেসে বললো বনহুর— কেউ আসবে না, কারণ সবাই সুখনিদ্রায় অচেতন। হাজারী সাহেব, বলুন নৎসার গুদামের চাল কি করেছেন আপনারা?

শুষ্ককণ্ঠে বললেন আব্বাস হাজারী—আমি জানি না।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে হাজারী সাহেবের দেহটা নড়ে উঠলো ভীষণভাবে, গর্জে উঠলো বনহুর—জানেন না? নৎসা গুদামের চাল কোথায় গেছে আপনি তার কিচ্ছু জানেন না?

বললাম তো বাবা আমি কিচ্ছু জানি না।

নৎসার চালের বস্তার পা হয়েছিলো তাহলে? পা দিয়ে হেঁটে হেঁটে বস্তাগুলো ইরামতি নদীবক্ষে ডুব দিয়েছে, কি বলেন?

হাঁ...না না...আমি বলছি তো কিছু জানি না।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে বনহুর—জানেন না বললেই রেহাই পাচ্ছেন না হাজারী সাহেব, আপনার চামড়া ছাড়িয়ে লবণ মাখিয়ে আপনার কাছ থেকে এর জবাব নেওয়া হবে। চলুন বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। কিন্তু তার পূর্বে চাবির গোছা দিন, কত টাকা মজুত আছে এখন আপনার সিন্দুকে?

টাকা—টাকা আমি কোথায় পাবো?

হাঁ, আপনি গরিব দুঃস্থ ব্যক্তি, কোথায় আপনি টাকা পাবেন...ঠিকই বলেছেন হাজারী সাহেব। দিন চাবি-দিন...

বাম হাতখানা বনহুর বাড়িয়ে দেয় হাজারী সাহেবের সম্মুখে।

বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না হাজারী সাহেব, তাঁর বুকের কাছে তখনও রিভলবার উদ্যত রয়েছে। চাবির গোছা বের করতেই বনহুর বলে উঠে—আপনি নিজ হস্তে সিন্দুকের তালা খুলুন এবং আজ সন্ধ্যায় যে টাকা আপনি সিন্দুকে তুলে রেখেছেন তা বের করে নিন।

টাকা! কিসের টাকা?

কিছু বুঝতে পারছেন না, তাই না? যে টাকা জাহাজ ৭৭৭-এর পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে আপনি আজ সন্ধ্যায় পেয়েছেন ঐ টাকা। বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখা আর হলো না হাজারী সাহেব। বের করুন ঐ টাকা......তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যান বলছি......

এবার হাজারী সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিন্দুকের দিকে পা বাড়ালেন। তিনি মনে মনে ভাবছেন কি করে এই জমকালো মূর্তি এত কথা জানতে পারলো। কি করে জানতে পারলো আজ সন্ধ্যায় তাঁর হাতে জাহাজ ৭৭৭-এর পণ্যদ্রব্য বিক্রি টাকা এসেছে এবং আগামীকাল বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা হবে, এত কথা জানে সে কি করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মত সাহস বা মনের বল তাঁর নেই! কোনো রকমে পালাতে পারলে একদফা বেঁচে যেতে পারতেন কিন্তু পালাবার কোনো উপায় নেই। হাজারী সাহেব সিন্দুকের পাশে এসে ইতস্ততঃ করছেন দেখে বনহুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—বিলম্ব হলে মাথাটা খোয়াবেন, কাজেই বিলম্ব না করে যত দ্রুত পারেন কাজ শেষ করুন।

হাজারী সাহেব হঠাৎ এমন বিপদে পড়বেন ভাবতে পারেন নি। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন। বনহুরের হাতে রিভলবারখানায় দৃষ্টি পড়তেই তিনি পুনরায় সিন্দুকের দিকে নজর ফেললেন। হাত দু'খানা যেন তাঁর আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

বনহুর ধমকে উঠলো—বলেছিতো বিলম্ব হলে মাথার খুলিটা হারাবেন।

এবার হাজারী সাহেব সিন্দুকের তালা খুলতে বাধ্য হলেন। অগত্যা বের করে আনলেন টাকার বান্ডিলগুলো।

বনহুর বান্ডিলগুলো রুমালে বেঁধে পকেটে রাখলো তারপর হাজারী সাহেবকে লক্ষ্য করে বললো—চলুন এবার।

হাজারী সাহেব ভেবেছিলেন টাকাগুলো দেবার পর মুক্তি পাবেন তিনি কিন্তু তাঁকেও যেতে হবে টাকাগুলোর সঙ্গে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকান তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে।

বনহুর রিভলবারের আগা হাজারী সাহেবের পিঠে চেপে ধরে বলে—চলুন, এক মূহূর্ত আর বিলম্ব করবেন না।

হাজারী সাহেব ঢোক গিলে বললেন—আমাকে......আপনি ...কোথায় নিয়ে যাবেন?

শ্বশুর বাড়িতে নয়, তবে বলতে পারেন যমালয়ে। হাঁ, মানুষ মৃত্যুর পর যমালয়ে যায় আপনি যাচ্ছেন জীবিত অবস্থায় কতবড় সৌভাগ্য আপনার!

ফ্যাকাশে মুখে বলেন হাজারী সাহেব—আমাকে এবারের মত মাফ করে দিন। জানি না আপনি কে, বলুন আপনি কি চান আমি তাই দেবো।

চমৎকার, এই তো চাই। চলুন যমালয়ে বসেই আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হবে। চলুন বলছি.....,

আব্বাস হাজারী একবার অসহায়ের মত তাকালেন তাঁর কক্ষের চারিদিকে। ভাল করে দেখে নিচ্ছেন তিনি জন্মের মত প্রাণভরে নিজের ঐশ্বর্যে ভরা ইমারতটিকে। তারপর অগ্রসর হলেন হাজারী সাহেব।

রাতের অন্ধকারে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললো বনহুর— উঠুন।

যন্ত্রচালিতের মত গাড়িতে উঠে বসলেন হাজারী সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিলো বনহুর, তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো—নিয়ে যাও, আমি আসছি।

গাড়িখানা উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর দুটো আঙ্গুল মুখে পুরে শিস দিলো, অমনি অন্ধকারে জমকালো ছায়ার মত এসে দাঁড়ালো তাজ।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাজের পিঠে চেপে বসলো।

❑

দিপালী বোন, এমনি করে আর কতদিন তুমি সহ্য করবে এই নরকজ্বালা? সত্যি তোমার কষ্ট আমি দেখতে পারি না। কথাগুলো বলে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো দিপালীর সঙ্গিনী তরুণী মালতী।

মালতী এককালে কোনো এক ভদ্রঘরের কন্যা ছিলো। তাকেও শয়তানদল চুরি করে এনেছে, তাকে দিয়েও ওরা চোরাচালানীর কাজ হাসিল করে নিচ্ছে। সে জানে, নাহলে ওরা যে নির্যাতন চালাবে তা কল্পনাতীত। দিপালীর উপর যে নির্মম নির্যাতন চলে তা মালতী লক্ষ্য করে শিউরে উঠে, তাই সে কোনো প্রতিবাদ করে না তাদের কাছে।

মালতী দিপালীর দেহে হাত বুলিয়ে বলে— কেন তুমি ওদের কথা মেনে নিচ্ছো না বোন? দেখো তো আমি সব নীরবে মেনে নিয়েছি, না নিয়ে আমার কোনো উপায় ছিলো না।

দিপালী উদাস ব্যাথাভরা কণ্ঠে বললো—তুমি পেরেছো বোন কিন্তু আমি যে পারি না। অন্যায় আমি সহ্য করতে পারি না। তবে হাঁ, একদিন পারতাম...তখন আমার জীবনে সে আসেনি—আমার হৃদয়ের জ্যোতির্ময়। মালতী, ওর কাছে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তা কোনদিন ভুলবো না, ভুলতে পারি না। রাজকুমার জ্যোতির্ময়......খিল খিল করে হেসে উঠে দিপালী।

মালতী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দিপালীর মুখের দিকে, তারপর বলে দিপালী দিদি, তুমি কি তার কথা ভেবে ভেবে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে?

মালতী, তুমি বুঝবে না, তুমি বুঝবে না বোন সে আমার কতখানি। তার কথা ভেবে যদি আমি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারি তাহলে মনে করবো আমি পরম ভাগ্যবতী কিন্তু আমি তা হরো? বল্ বল্ মালতী, আমি কি চিরদিন তাকে হৃদয়ে ধারণ করে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে মুছে যেতে পারবো?

মালতী দিপালীর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—দিপালী, যার কথা তুমি অহঃরহ ভাবছো সেকি কোনো সময় তোমার কথা ভাবছে? ভাবলে নিশ্চয়ই সে তোমার সন্ধান করতো। আজ তুমি কোথায় কিভাবে আছো তাও সে জানে না। প্রতিদিন তোমার উপর কি অকথ্য অত্যাচার চলছে, আজ তোমার সঙ্গী সাথী একদল কুকুর—এসব কিছু জানে না সে?

সত্যি মালতী সে এসব কিছু জানে না, জানলে সে কিছুতেই নীরব থাকতে পারতো না। জানি না সে এখন কোথায় কি করছে। তবে আমার বিশ্বাস সে নীরব বা নিশ্চুপ নেই......

হাঁ, ঠিক বলেছো দিপালী দিদি তোমার জ্যোতির্ময় যেমন মানুষ তাতে সে নীরব আছে বলে মনে হয় না। হয়তো সে তোমার সন্ধান করে ফিরছে। নিশ্চয়ই সে একদিন তোমাকে উদ্ধার করবে।

সত্যি, আমার মনও তাই বলে আমার জ্যোতির্ময় একদিন আসবেই আসবে। আচ্ছা মালতী, বলতে পারিস্ শয়তানের দল কুকুরগুলো দিয়ে কি করে?

ও, এ কথা তুমি জানোনা বুঝি?

না বোন, আমি জানবো কি করে?

এই শয়তান দলেরই একজন আছে, নাম তাঁর জগন্নাথ বর্মা। যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি নরপশু। হিংস্র জানোয়ারের মত সে। সেই জগন্নাথ বর্মা এই কুকুরগুলোর মালিক। এই কুকুরগুলো দিয়ে সে জিঘাংসা চরিতার্থ করে।

থাক্ আর বলিস্ না, আমি শুনতে চাই না কিছু। মালতী আমি সহ্য করতে পারছি না এদের এই নিষ্ঠুর আচরণ।

তাইতো বলি আমি যেমন মেনে নিয়েছি এদের সবকিছু, তেমনি তুমিও মেনে নাও দেখবে জীবন সুখের না হলেও কিছুটা স্বস্তি পাবে।

মালতী, আমি নিজে নিষ্পেষিত হবো, তবু পারবো না অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে।

বোন, একদিন আমিও তোমার মত ছিলাম—শুধু আমি নই, এখানে আরও অনেক মেয়েরা আছে সবাই ভদ্রঘরের মেয়ে, তারা কেউ চায়নি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে কিন্তু নরপশুদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে বাধ্য হয়েছে সবাই। শুধু তুমি আজও কঠিন ইস্পাতের মত সোজা হয়ে আছো, মেনে নাওনি ওদের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে।

মালতী তবু পারলাম কই নিজেকে রক্ষা করতে। আমাকে ওরা ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করেছে। আমার জীবনকে ওরা বিনষ্ট করে দিয়েছে। মালতী, আমি বেঁচেও আজ মরে গেছি। এ অপবিত্র জীবন নিয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করছি। তবে বড় সাধ বড় আশা ছিল মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমি যেন আমার জ্যোতির্ময়কে দেখতে পাই। মালতী, তুই জানিস না সে কতবড় মহান মহাপুরুষ......দিপালীর চোখ দুটো যেন দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

এমন সময় লৌহ দরজা খুলে যায়। একজন দীর্ঘদেহী কঠিন চেহারার মানুষ এসে দাঁড়ায় সেখানে। দু'চোখে তার শার্দুলের দৃষ্টি, জীবন্ত শয়তান বলে মনে হয় তাকে।

লোকটার দু'পাশে দু'জন লোক, এরা শয়তান লোকটার দেহরক্ষী হিসেবে এসেছে বলে মনে হলো। দিপালী এখানে আসার পর একে কোনোদিন দেখেনি। লোকটার পিছনে আরও দু'জন, সর্বসমেত ওরা পাঁচজন এসেছে।

দিপালী লক্ষ্য করলো লোকটা আসার সঙ্গে সঙ্গে মালতীর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। দিপালী কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝলো যে, লোকটা কোনো ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। এখানে যারা পুরনো লোক তারা এই লোকটাকে সমীহ করে চলছে।

মালতী দিপালীর কানে মুখ নিয়ে বললো—ইমরান এরই নাম।

দিপালীর মুখখানাও শুকিয়ে গেলো, না জানি আজ তাদের ভাগ্যে কি আছে! ওর চোখ দুটো লালসায় ধক্ ধক্ করে যেন জ্বলছে।

দিপালীর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো, তারপর শিয়ালের মত জিভ দিয়ে মোটা ঠোঁট দুটো চেটে নিয়ে বললো—লক্ষ্মীরা, এই মেয়েটি বুঝি সেই মেয়ে? একেই আমার চাই......

পিছন থেকে একজন সামনে এসে দাঁড়ালো, বললো সে—একে নিয়ে কি হবে ইমরান সাহেব। এই মেয়েটি কোনো কাজের মেয়ে নয়, বড় অবাধ্য।

অট্টহাসি হেসে উঠলো ইমরান, হাসি থামিয়ে বললো—আকরাম হোসেন, বিজলী বাবু, মরিস আলী যাকে আয়ত্তে আনতে পারেনি, আমি তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে কাজের করে তুলবো, তারপর দেখবে কেমন সে পোষা কুকুরগুলোর মত বাধ্য হয়ে যায়।

কথাগুলো শুনে শিউরে উঠলো দিপালী।

মালতীর মুখমন্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। এ ওর মুখের দিকে চাইছে বারবার।

ইমরান লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে দিপালীর দিকে। যদিও দিপালীর দেহে অসংখ্য ক্ষতের দাগ ফুটে রয়েছে, যদিও ক্ষুধা-পিপাসায় তার চেহারা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, যদিও তাকে দেখলে একটি জীবন্ত কঙ্কাল বলে মনে হয়, তবু বিপালীর সৌন্দর্য ইমরানকে আকৃষ্ট করে।

ইমরান তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলে—একে চাই বুঝেছো?

বুঝেছি ইমরান সাহেব, কিন্তু......

কোনো কিন্তু নয়, কুকুরগুলোর সঙ্গে একেও তুলে দিও গাড়িতে।

আচ্ছা ইমরান সাহেব।

ইমরান মালতীর চিবুকে নাড়া দিয়ে বললো—সুন্দরী, এবারের মত তুমি থেকে যাও, কেমন?

মালতী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে রইলো।

ইমরান বেরিয়ে গেলো তার দলবল নিয়ে।

মালতীকে জড়িয়ে ধরলো দিপালী—আমাকে ঐ নরপশুর হাত থেকে রক্ষা কর্ বোন......আমাকে তুই রক্ষা কর্......কাঁদতে থাকে দিপালী।

মালতী জানে, ইমরান কত ভয়ঙ্কর নরপশু। ওর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নয়। মালতীর চোখের সামনে ভেসে উঠে কত দিনের কত ছবি। ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায়, সে বলে—বোন, আমি তোমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবো না, কারণ ঐ নরপশু মানুষ নয়, হিংস্র শার্দুলের চেয়েও সাংঘাতিক। ওর কবল থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। আমাকেও ও নিঃশেষ করে ফেলেছে। জানো দিপালী দিদি যেদিন প্রথম আমাকে এরা ধরে নিয়ে এলো সেদিনের কথা...আজও ঐ দিনটা আমি ভুলিনি, ভুলতে পারবো না কোনোদিন। দিপালী দিদি, শুনবে আমার সে কাহিনী.....

কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে!

অমন ভয় আমারও করেছিলো একদিন। শোনো... সেদিন আমি কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। কোনো যানবাহন না পাওয়ায় হেঁটে হেঁটেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় পিছন থেকে হঠাৎ দু'জন লোক আমাকে ধরে ফেললো। আমি চিৎকার করতে গেলাম কিন্তু পারলাম না, ওরা আমার মুখে রুমালচাপা দিয়েছে। আমি হাত-পা ছুড়তে লাগলাম কিন্তু একটুও হাত-পা নড়াতে পারলাম না, ক্রমে শিথিল হয়ে এলো আমার সমস্ত শরীর। মাথাটা তখন ঝিমঝিম করছে তারপর আর কিছু মনে নেই। ......যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখলাম আমি এক অর্ধ অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে আছি। আমার পাশে একটি নরপশু বসে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললো—সুন্দরী, এতক্ষণে বুঝি হুশ হলো......ওর কথা শুনে বুঝতে পারলাম, সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গিয়ে দেখলাম আমার দেহে কোনো বসন নেই, আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছি। লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, কারণ আমি বুঝতে পারলাম নরপশু আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আমি দেহের নানা স্থানে যন্ত্রণা অনুভব করলাম।

লোকটা জড়িতভাবে বলে চলেছে—লজ্জা করছে বুঝি? ছিঃ ছিঃ লজ্জার কোনো কিছু নেই। শুধু তুমি আর আমি এই তো...এখানে আর তৃতীয় ব্যক্তি নেই। কাকে দেখে তুমি লজ্জা করছো.....

আমি আমার বস্ত্রের সন্ধানে চারদিকে তাকালাম। দেখলাম মেঝেতে ছড়িয়ে আছে আমার পরিধেয় শাড়ি-ব্লাউজ। বড় কান্না পেলো তবু চিৎকার করে কাঁদতে পারলাম না। কোথা থেকে কি হলো, আমি এখন কোথায়, কে এই নর শয়তান কিছু বুঝতে পারলাম না। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। আমি পড়ে গেলাম পুনরায় বিছানায়।

এরপর যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলাম আমি একা, কেউ নেই আমার পাশে। আমি নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সমস্ত শরীর বিবস্ত্র, মেঝেতে তাকিয়ে দেখলাম এখনও আমার শাড়ি-ব্লাউজ তেমনি সেখানে পড়ে আছে।

আমি উঠে গিয়ে শাড়ি-ব্লাউজ তুলে নিলাম, কিন্তু পরতে গিয়ে কান্নায় বুক ভেসে গেলো, কারণ আমার এ অপবিত্র দেহে সেই শাড়ি-ব্লাউজ অসহ্য মনে হলো। ঐ শাড়ি-ব্লাউজ যে আমার অনেক পবিত্র, তবু পরলাম। হঠাৎ চোখ ফেরাতেই নজর পড়লো ওপাশে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম, নিজের চেহারা আয়নায় দেখে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হলো। সমস্ত শরীরে দাগ এবং ক্ষত দেখতে পেলাম। সেই নরশয়তানটি আমার এ অবস্থা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি নিজের চেহারা দেখে নিজেই দু'হাতে চোখ ঢাকলাম।

জানো দিপালী দিদি, সেদিন থেকে আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। ঐ নরপশুই হলো শয়তান ইমরান। আর ফিরে যাওয়ার পথ আমি পেলাম না। আজ দীর্ঘ তিনটি বছর হলো আমি হারিয়ে গেছি আবার বাবা-মা-দাদার কাছ থেকে। হয়তো বাবা-মা-দাদা আমাকে কত খুঁজছেন। হয়তো কেঁদে

কেঁদে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন......বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে মালতী—শুধু আমি নই, আমার মত আরও বহু তরুণী এই শয়তানদের আড্ডাখানায় বন্দী আছে। সবাই তারা আমাদেরই মত নির্যাতিত।

দিপালী কেঁদে উঠে— বোন, আমাদের কি হবে, এর শেষ কোথায়?

কে জানে দিপালী দিদি এর শেষ কোথায়। ঐ যে এলো ঐ এলো এবার ওরা তোমাকে নিয়ে যাবে। ঐ দেখো কুকুরগুলোর জন্য বড় বড় বাক্স নিয়ে আসছে।

দিপালীর চোখ দুটো ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলো। জড়িয়ে ধরলো সে মালতীকে। মালতীও ওকে বুকে আঁকড়ে ধরে ওর মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ততক্ষণে কুকুরগুলোকে দু'জন বলিষ্ঠ লোক বড় বড় চারটা বাক্সে তুলে নিচ্ছে।

কুকুরগুলো কি সহজে বাক্সে উঠতে চায়। বাক্সের মধ্যে এক একটি মাংসের টুক্‌রা ছুড়ে মারছে আর কুকুরগুলো সেই মাংসের টুকরাগুলোর লোভে বাক্সে প্রবেশ করছে।

কুকুরগুলোকে বাক্সে উঠানো শেষ করে লোক দু'জন এগিয়ে এলো মালতী আর দিপালীর দিকে। দু'জন দু'জনকে আঁকড়ে ধরে আছে। দু'টি অসহায় তরুণী শয়তান নরপশুদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু কোনো উপায় নেই।

লোক দু'জন দিপালীকে ছাড়িয়ে নিলো মালতীর কাছ থেকে। তারপর একরকম প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো ওরা ওকে।

❑

আক্কাস হাজারীর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। সমস্ত দেহে বেত্রাঘাতের চিহ্ন। স্থানে স্থানে জামা ছিড়ে রক্ত ঝরছে। চুলগুলো

এলোমেলো। আব্বাস হাজারী তাঁর নাদুস নুদুস দেহখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখোচোখে করুণ অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। পা দু'খানা তাঁর থরথর করে কাঁপছে।

সম্মুখে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু বনহুর। চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—হাজারী সাহেব, এখনও গোপন করবার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছেন? বলুন নৎসা গুদামের চালের বস্তা নদীগর্ভে গেলো কি করে? বলুন—জবাব দিন......

এ্যাঁ...... মেরো না আর, সব বলছি।

হাঁ, সব বলুন? নাহলে বলছি চামড়া ছাড়িয়ে লবণ মাখিয়ে আপনাকে বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবো। বলুন, সব কিছু বলুন......

আর মেরো না, আমি সব বলছি। বললে আমাকে ছেড়ে দেবে তো?

সেটা আমি তখন বিবেচনা করে দেখবো। এবার বলুন কেন নৎসার গুদামের বস্তা বস্তা চাল আপনি নদীর বুকে ডুবালেন?

তোমার ভয়ে।

আমার ভয়ে?

হাঁ হাঁ বাবাজী......

কেন, ও চালগুলো তো আপনি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারতেন? বলুন কেন তা করেননি?

আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমার কয়েকজন বন্ধুলোক মহান ব্যক্তি।

মহান ব্যক্তি?

হাঁ, তাঁরা বলেছিলেন ও চাল গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার পরিবর্তে নদীগর্ভে ফেলে দাও তবু কেউ জানতে পারবে না আমাদের গুদামে এত চাল মজুত ছিলো, তাই......

ও, তাই আপনি এ কাজ করেছিলেন? জনগণের কাছে আপনারা সাধু সেজে ভিতরে ভিতরে তাদের মাথায় কুঠারাঘাত করেছেন। আপনারা শুধু নরপশুই নন, জীবন্ত শয়তান। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাতের চাবুক গিয়ে পড়ে আব্বাস হাজারীর নরম তুলতুলে পিঠে।

তীব্রস্বরে কেঁদে উঠেন আক্কাস হাজারী—আর মেরো না বাবা, আমাকে মাফ করে দাও......

মাফ! মাফ করবো আমি। হাঃ হাঃ হাঃ...অট্টহাসি হেসে উঠে বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—মাফ তবু একবার করেছিলাম। হাজারী সাহেব, আপনি ঠিকই তার উচিত কাজ করেছেন। যা বলেছিলেম তাই আপনি করেছিলেন, তাই না? আপনি সেদিনের পর সাধু বনে গিয়েছিলেন একেবারে। হাজারী সাহেব, যে পাপ আপনি করেছেন সে পাপের মাফ নেই। খোদা আপনাকে মাফ করতে পারেন তবু আমি করবো না......আমি আপনাকে হত্যাও করবো না। হত্যা করে আপনার পাপ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবো না, আপনাকে আমি জীবন্ত রাখবো পাপের প্রতীক হিসেবে। পৃথিবীর ইতিহাসে আপনিও হবেন আইকম্যান, মুসৌলিনী, হিট্‌লার এবং মিরজাফরের মত অমর-অক্ষয়। জনগণের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে আপনারা যে রংবাজি খেলছেন তা বর্ণনাতীত। বলুন, কোন্ কোন্ মহান নেতা আপনার সঙ্গে জড়িত আছেন...তাঁদের নাম বলুন এবং কোথায় কোথায় আপনাদের ব্যবসাকেন্দ্র আছে তাও বলুন।

হাজারী সাহেব ঢোক গিললেন, তারপর ভয়কম্পিত কণ্ঠে বললেন—আমি কিচ্ছু জানি না?।

কি বললেন এখনও মিছে কথা! কিছু জানেন না আপনি?

না।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাতের চাবুক এসে পড়লো হাজারী সাহেবের পিঠে।

যন্ত্রাণায় আর্তনাদ করে উঠলেন হাজারী সাহেব। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—বলছি বাবা সব বলছি আর মেরো না, আর মেরো না বাবা......

তবে বলেন কোন্ কোন্ মহান ব্যক্তি আপনাকে নৎসা গুদামের চাল পানিতে ডুবাতে পরামর্শ দিয়েছিলেন?

বলবো, সব বললো—তাহলে মুক্তি দেবে তো?

বলেছি বিবেচনা করে দেখবো।

হাজারী সাহেব এবার একে একে সবগুলো হাজারী দলের অভিভাবকের নাম উচ্চারণ করেন।

বনহুর নিজে কাগজ-কলম নিয়ে নামগুলো লিখে নিতে শুরু করে।

হাজারী সাহেব যাঁদের নাম বলে চলেছেন তাঁরা হলেন এক একজন মহান ব্যক্তি, দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, এঁদের কথায় দেশের সব কাজ চলে। এদের অংগুলি হেলনে পুলিশ মহল উঠে বসে, এমনকি আইন-আদালত এদের হাতের মুঠোয়।

সবার নাম বনহুর এক এক করে লিখে নিয়ে পাশে লিখলো কোন্ মহান ব্যক্তি কোন্ সরকারি পদ দখল.করে আছেন। এ ছাড়াও কে কোথায় অবস্থান করছেন। কার কোন্ বিদেশী ব্যাঙ্কে কত টাকা মজুত আছে। বিদেশে কে কয়টা বাড়ি এবং গাড়ি করে দেখছেন...কারণ দেশে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন বিমানযোগে দেশ ছেড়ে পালিয়ে বিদেশে সুখে-শান্তিতে পরিবার পরিজন নিয়ে কালাতিপাত করতে পারেন। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো বনহুর। একটা কঠিন কঠোর ভাব ফুটে উঠে তার মুখমন্ডলে। একবার লিষ্টখানার দিকে, একবার হাজারী সাহেবের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর। লিষ্টখানা দু'একবার পড়ে নিয়ে বলে—এই লিষ্ট আমার কাছে রইলো, মনে রাখবেন হাজারী সাহেব এরা কেউ রক্ষা পাবে না। সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে আদালতে নয়—জনগণের কাছে।

আমাকে মুক্তি দেবে বলেছিলে বাবা!

মুক্তি!

হাঁ মুক্তি...আমাকে মুক্তি দেবে না তুমি?

দেবো কিন্তু আজ বা কাল নয়, জনগণের আদালতে যেদিন আপনাদের বিচার শেষ হবে সেদিন আপনি মুক্তি পাবেন, তার পূর্বে নয়।

তুমি যে বলেছিলে?

হাঁ, বিবেচনা করছি। রহমান!

সঙ্গে সঙ্গে রহমান প্রবেশ করে সেখানে। মনে হলো রহমান পাশেই কোথাও অবস্থান করছিলো, এসে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো।

বললো বনহুর—একে নিয়ে যাও, রামসিংহের হাতে একে তুলে দাও। জম্বুর ভূগর্ভে অন্ধকারাকক্ষে বন্দী করে রাখতে বলো। প্রতিদিন দু'খানা শুকনো রুটি এবং এক গেলাস পানি একে খেতে দেবে যেন জীবন বেঁচে থাকে।

বাবা, তুমি এত নির্দয়? তবে যে কত শত শত গরিব দুঃখীর মধ্যে তুমি হাজার হাজার মণ চাল-খাবার-বস্ত্র বিলিয়ে দাও? আমাকে তুমি শুধু দু'খানা শুকনো রুটি দিতে বললে! না না, আমি শুকনো রুটি খেতে পারবো না কোনো দিন আমি রুটি স্পর্শ করিনি, এখন কি করে আমি তা খাবো?

হেসে উঠলো বনহুর—এতদিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ দুঃস্থ মানুষের মুখের আহার কেড়ে ঘি, মাখন, দধি খেয়েছেন, খেয়েছেন পোলাও, কোরমা, ফিরনী। এবার বুঝবেন যাদের মুখের গ্রাস নিয়ে আপনারা এসব জৌলুসি খাবার খেয়েছেন তারা কেমন খাবার খেয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে। নিয়ে যাও রহমান, আর এক মুহূর্ত ওর মুখ আমি দেখতে চাই না। হয়তো ওকে আমি রাগের বশীভূত হয়ে হত্যা করেও ফেলতে পারি। কিন্তু হত্যা করা চলবে না। হত্যা করলে সব দুঃখকষ্ট অচিরে শেষ হয়ে যাবে, বুঝবে না লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ মানুষ কেমন করে বেঁচে আছে। আমি একে জানাতে চাই, অনুভব করাতে চাই সবকিছু। রহমান আব্বাস হাজারী সাহেবকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু হাজারী সাহেব বনহুরের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন—বাবা, আমাকে তুমি মাফ করো। শপথ করে বলছি আর এমন কাজ করবো না......

কিন্তু বনহুর তার কথার কোনো জবাবই দেয় না।

রহমান তাকে নিয়ে চলে যায়।

বনহুর পায়চারী করতে থাকে, দক্ষিণ হস্তে তার সেই লিষ্ট, লিষ্টখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে চলে সে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে রহমান।

বনহুর বলে—হাজারী দলের সব কটার ঠিকানা পেয়েছি রহমান। দেশের অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে আনতে হলে এদের শায়েস্তা করতে হবে, নাহলে দেশে কোনোদিন পরিবর্তন আসবে না।

সর্দার, সরকার নাকি এখন অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে, কার গুদামে কত পণ্যদ্রব্য মজুত আছে, কার ঘরে কত খাদ্য মজুত রেখেছে, কোন্ ব্যবসায়ী অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করছে—সবরকম মুনাফাকারীদের শাস্তিদান করার জন্য পুলিশ মহল ছাড়াও মিলিটারী নিয়োগ করা হয়েছে......

হাসালে রহমান, হাসালে। পুলিশ মহল কোনোদিনই এ সব মুনাফাকারী অসৎ ব্যবসায়ীদের সন্ধান পাবে না, কারণ যাদের সন্ধানে তারা গোটা জম্বু চষে ফিরছে তারাই যে তাদের পরিচালক! কাজেই বুঝতে পারছো চিনেও না চেনার ভান করবে। হঠাৎ যদি কেউ ভুলক্রমে ধরা পড়ে যায় তাহলে যেমন কান টানলে মাথা এসে যায় আর সেই মাথার চোখ দুটো যখন চোখ পাকিয়ে তাকায় তখন পুলিশ মহলের কচুঘাটির মত অবস্থা হয়। কাজেই এ অভিনয় জনগণ আর ভুলবে না। তবে মিলিটারী মহল যদি সত্যিকারের কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহলে দেশ ও দশের কিছু উন্নতি সাধন হতে পারে।

সর্দার, আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি কবে কোন্ সময় দেশে সত্যিকারের ন্যায়নীতি, আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সেদিন আমি হবো নিশ্চিন্ত।

রহমান এবং বনহুরের কথা হচ্ছিলো, ঠিক ঐ সময় রামসিং সেই কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে উঠে—সর্দার, ইরামতী নদীতে যে নৌকা আমরা আটক করেছিলাম সেই নৌকার সমস্ত খাদ্যশস্য আমরা গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলাম কিন্তু......

বলো কিন্তু কি?

খাদ্যদ্রব্যগুলো যখন আমরা বিলিয়ে দিচ্ছিলাম ঐ মুহূর্তে পুলিশ ফোর্স হামলা করে বিলি করা মাল আটক করে দেয় এবং আমাদের দু'জন লোককে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।

রামসিং, তুমি থাকতে এমন অবস্থা হলো কি করে? আমাদের লোককে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলো বলো কি?

হাঁ সর্দার, আমাদের দু'জনকে ধরে নিয়ে গেছে এবং নৌকার সমস্ত মাল পুলিশ আটক করে ফেলেছে।

তোমরা সাবধানে কাজ করোনি কেন?

সর্দার, আমরা অত্যন্ত সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলাম তবু কি করে যে পুলিশ বাহিনী এ ব্যাপারে জানতে পারলো বুঝতে পারছি না। সর্দার, ওরা আমাদের লোক দু'জনকে পাকড়াও করে নিয়ে বেশিদূর যেতে পারেনি, হয়তো জম্বু পর্বতের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

ওরা কি পুলিশ ভ্যান নিয়ে এসেছিলো?

হ্যাঁ সর্দার, পুলিশ ভ্যান নিয়েই পুলিশ ফোর্স এসেছিলো। আচমকা ওরা আমাদের চারপাশ ঘিরে ফেলে এবং সেখানে যে সব দুঃস্থ জনগণ ছিলো তাদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কেড়ে নেয়। যখন পুলিশ ফোর্স ঘিরে ফেলে দুঃস্থ জনগণকে লাঠি চার্জ করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলো তখন আমি জনগণের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সরে আসি।

আর তোমার লোকজনদের পুলিশ ফোর্স বন্দী করে, তাই না?

সর্দার, এ ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। আমি আপনাকে সংবাদ দিতে ছুটে এলাম। পুলিশ ফোর্স আমাদের লোক দু'জনকে বন্দী করে রাখে এবং পরে একটি বড় ট্রাক এনে তাতে নৌকা থেকে নামানো খাদ্যশস্যগুলো ওরা ট্রাকে তুলতে থাকে, আমি সেই সময় চলে এসেছি। সর্দার তাই আমার মনে হয় ওরা বেশি দূর যেতে পারেনি।

হাঁ, সময়মতই এসেছো। রহমান, এই মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নাও। যাও রামসিং, তুমিও তৈরি হয়ে নাও, এক্ষুণি রওয়ানা দেবো......

বনহুর বেরিয়ে আসে আস্তানার বাইরে।

তাজ এবং আরও কয়েকটি অশ্বকে তখনই নিয়ে আসা হলো।

রহমান, এবং রাম সিং ছাড়াও আরও দু'জন অনুচর সহ বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসলো। তাজ তার স্বভাব অনুযায়ী পা দু'খানা তুলে চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ শব্দ করে উঠলো।

তীরবেগে ছুটে চললো বনহুর তার অশ্ব নিয়ে। তাকে অনুসরণ করে ছুটে চলেছে রহমান, রামসিং এবং আরও দু'জন অনুচর।

জম্বুর নির্জন বনভূমি অতিক্রম করে ইরামতী নদী তীর ধরে অশ্বগুলো ছুটছে।

ওদিকে পুলিশ বাহিনী ট্রাকভর্তি মাল তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ট্রাকের অগ্রভাগে এগিয়ে যাচ্ছে একটি পুলিশ ভ্যান। ঐ পুলিশ ভ্যানেই রয়েছে রামসিংয়ের দু'জন সহচর।

গাড়ি দু'খানা খুব দ্রুত জম্বুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। তারা নির্জন পর্বতপথ অতিক্রম করে জনবহুল পথে এসে পড়তে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়। যে পথে তারা এখন এগিয়ে চলেছে এ পথ নিরাপদ নয়, এ কারণেই পুলিশ বাহিনী তাদের গাড়ি দ্রুত চালনা করে চলেছে।

বনহুর তখন দলবল নিয়ে উল্কাবেগে এগুচ্ছে। যেমন করে হোক তার লোক দুটিকে উদ্ধার করতেই হবে। উদ্ধার করতে হবে ট্রাকভর্তি খাদ্যশস্যগুলো। জম্বুর পাথুরিয়া মাটির বুকে অশ্ব খুরের শব্দ অদ্ভুত শোনাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বনহুর ও তার দলবল সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা অতিক্রম করে এগুচ্ছে।

বনহুরের দেহে জমকালো পোশাক।

তার অনুচরদের দেহেও জমকালো পোশাক তবে রামসিংয়ের দেহে সাধারণ পোশাক ছিলো। কারণ রামসিং সাধারণ পোশাকেই ইরামতী নদীতীরে চোরাই খাদ্যশস্যগুলো গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলো। পোশাক পরিবর্তন করার সময় রামসিং পায়নি। তাই তার দেহে ছিলো স্বাভাবিক পোশাক।

বনহুর দলবল নিয়ে বহুক্ষণ ছুটে চলার পর একসময় গাড়ির শব্দ শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব থামিয়ে ফেলে সে, তার দলবলও নিজ নিজ অশ্বের লাগাম টেনে ধরে।

বনহুর বলে—রহমান, গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছো?

রহমান, রামসিং একই সঙ্গে বলে উঠে—হাঁ সর্দার, মোটর গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বনহুর বললো— তোমরা পথের দু'পাশে আত্নগোপন করো। গাড়ি এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে করে গুলী ছুড়বে। সাবধান, ট্রাকটির চাকায় যেন গুলীবিদ্ধ করোনা।

আচ্ছা সর্দার।

ওরা পথের দু'পাশে আত্নগোপন করে। চারদিকে গহন জঙ্গল, কাজেই অশ্বসহ আত্নগোপন করতে কোনো অসুবিধা হল না।

গাড়ির শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

পুলিশ ভ্যান সহ মাল বোঝাই ট্রাকটি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লো গাড়ি দু'খানা। নিকটে অতি নিকটে এসে পড়েছে।

আচমকা বনের মধ্য থেকে এক ঝাঁক গুলী বেরিয়ে এলো সাঁ সাঁ করে। বিদ্ধ হলো পুলিশ ভ্যানটির পিছনের চাকায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যানটি দাঁড়িয়ে পড়লো জনহীন পথের বুকে। দু'পাশে গহন জঙ্গল, আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন নেই।

পুলিশ ভ্যানটি অকেজো হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ ট্রাকটি কিছুদূর অগ্রসর হয়েই থেমে গেলো।

পুলিশ ভ্যান ছেড়ে পুলিশ বাহিনী নেমে দাঁড়ালো পথের উপর, তারপর জঙ্গল লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলী ছুঁড়তে লাগলো।

বনহুর দলবল নিয়ে তখন প্রতীক্ষা করছে। মাঝে মাঝে বনহুর ফাঁকা গুলী ছুঁড়তে লাগলো। সে জানে, পুলিশ বাহিনীর কাছে যথেষ্ট গোলাগুলী মজুত নেই, আর তারা প্রচুর গোলাগুলী সঙ্গে এনেছে। বনহুরের দল যদি

একটা কিংবা দুটো গুলী ছোড়ে তাহলে একসঙ্গে পুলিশ বাহিনী দশটা গুলি ছোড়ে। এক মিনিট দু'মিনিট তিন মিনিট করে প্রায় এক ঘন্টা ধরে গুলী বিনিময় হলো। এবার পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে কোনো গোলাগুলীর শব্দ আসছে না।

বনহুর পর পর আরও কয়েকটা গুলী ছুড়লো, কিন্তু পুলিশ বাহিনীর তরফ থেকে আর কোনো গোলাগুলী নিক্ষিপ্ত হলো না।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে উদ্যত রাইফেল হাতে এগিয়ে এলো, কঠিন কণ্ঠে বললো—অস্ত্রগুলো মাটিতে ফেলে দাও। যদি মঙ্গল চাও এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না।

সঙ্গে সঙ্গে রহমান, রামসিং এবং অন্য অনুচর দু'জনও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে, সবার হাতে উদ্যত রাইফেল।

পুলিশ বাহিনীর অস্ত্র নীরব, কারণ একটি গুলীও তাদের অবশিষ্ট ছিলো না। আচম্‌কা এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হবে এতটা ভাবতে না পারলেও প্রস্তুত ছিলো তারা। তবু পুলিশ বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়েছে, কারণ তারা প্রায় এক ঘন্টাকাল গোলাগুলী নিক্ষেপ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

বনহুর ও তার সঙ্গীদের অস্ত্রের মুখে পুলিশ বাহিনী একেবারে থ' মেরে যায়, কারণ আচম্‌কা আক্রমণে ভীষণভাবে ভড়কে গেছে ওরা।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলে— ফেলে দাও তোমাদের হাতের অস্ত্র।

পুলিশ বাহিনী বাধ্য হলো অস্ত্র ফেলে দিতে। কারণ তাদের অস্ত্রে কোনো গুলী ছিলো না। বেশ কিছুক্ষণ আতঙ্কিতভাবে গোলাগুলী ছোঁড়ার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো ওরা।

পুলিশ ফোর্স অস্ত্র মাটিতে নিক্ষেপ করতেই বনহুর বললো—রহমান, এদের অস্ত্রগুলো সম্মুখের জলাশয়ে ফেলে দাও এবং এদের জীবনে হত্যা না করে হাত-পা-মুখ বেঁধে পথের ধারে ফেলে রাখো। যদি কোনো পথচারী এ পথে আসে তাহলে এরা রক্ষা পাবে, নাহলে......কথা শেষ না করেই বনহুর পুলিশ প্রধানের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। দক্ষিণ হস্তে তার চিবুকটা তুলে ধরে বলে—দেশের জনগণের সম্পদ যখন দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায় তখন

আপনারা পারেন না তা রক্ষা করতে। পারেন না কত মাল কোন্ পথে চোরাচালান হচ্ছে তার হিসেব রাখতে। আপনারা এসেছিলেন উদ্ধারকৃত মাল উদ্ধার করতে। যারা চোরাই মাল উদ্ধার করে এনে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলো তাদের গ্রেপ্তার করেছেন। এছাড়া আপনারা কিইবা করবেন, যেভাবে সরকার আপনাদিগকে চালাচ্ছেন ঐভাবেই তো চলবেন। আপনারা তো নাচের পুতুল।

ইন্সপেক্টর সাহেব প্রবীণ ব্যক্তি, তিনি বনহুরের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি—হাঁ, ঠিকই বলছো আমরা পুলিশ মহল নাচের পুতুলই বটে!

বনহুর বললো— দেখুন সত্যিকারের দুষ্কৃতিকারীদের আপনারা গ্রেপ্তার করুন এবং শাস্তি দিন।

হাঁ, আমরা তাই করবো। ভয়কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ইন্সপেক্টর সাহেব।

হেসে বললো বনহুর— করতে চাইলেও করতে পারবেন না, কারণ কোনো দৃস্কৃতিকারী গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে টেলিফোন এবং টেলিফোন এমন জায়গা থেকে আসবে যা না শুনে উপায় থাকবে না পুলিশ মহলে। পুলিশ মহল দুস্কৃতিকারী জেনেও তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। বলুন সত্য কিনা।

হাঁ যা বলছো সব সত্যি।

তাহলে দেশে ন্যায়নীতি, আইন-শৃঙ্খলা কোথায়? আপনারা সবই বুঝেন সবই জানেন তবু পারেন না ন্যায্যভাবে কাজ করতে।

কে... কে তুমি? কি করে তুমি বুঝলে আমাদের মনের কথা? বলো কে তুমি?

না, আজ বলবো না কে আমি। যেদিন সময় আসবে ঐ দিন জানতে পারবেন আমার পরিচয়। শুনুন আপনারা যাদের গ্রেপ্তার করে শাস্তিদান করেন তারা তো সামান্য লোক। হয়তো সামান্য ভুলের জন্য তারা নাজেহাল

পেরেশান হয় আপনাদের কাছে। আপনারাও মনে করেন বড় দুস্কৃতিকারী গ্রেপ্তার করেছেন কিন্তু আসল যারা দুস্কৃতিকারী তারা হলেন তিনতলার মানুষ। তাদের নাগাল পাওয়া আপনাদের পক্ষেও সম্ভব হয় না, কারণ তারাই যে নাচাচ্ছে আপনাদের......শুনুন, সাবধান হয়ে যান, অন্যায়কে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না সে যেই হোক।

শপথ করছি আমরা সত্যিকারের দোষী যারা, এবার থেকে তাদের শায়েস্তা করবো......

কিন্তু পারবেন না ইন্সপেক্টর সাহেব, পারবেন না, কারণ আপনারা চাকরিজীবী। তবু খেয়াল রাখবেন অন্যায়কে কোনো সময় প্রশ্রয় দেবেন না। হর্তা-কর্তা-বিধাতাও যদি অপরাধ করেন তবু তাদের বিচার হবে। বিচারে ন্যায্য প্রাপ্য শাস্তি তারা পাবে...

শপথ করলাম তোমার কথা স্মরণ থাকবে। ইন্সপেক্টর করজোরে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

বনহুর ততক্ষণে দলবল নিয়ে তার অনুচর দু'জনকে মুক্ত করে নেয়। যারা বন্দী হয়েছিলো তারা আনন্দে সর্দারের করমর্দন করে।

বনহুর বললো—রহমান, তুমি মাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে হিজলা অভিমুখে চলে যাও। তোমার সঙ্গে একজনকে নাও, আর একজন তোমার অশ্ব নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুক।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে ট্রাকের ড্রাইভ আসনে গিয়ে বসে।

বনহুর সঙ্গীদের সহ নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে।

পিছনে পড়ে থাকে পুলিশ ভ্যান ও কয়েকজন পুলিশ বাহিনীর লোক ও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

ধীরে ধীরে অশ্বপদ শব্দ মিলিয়ে এলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টর বিস্ময় নিয়ে ভাবছেন কে এই ব্যক্তি।

❑

বনহুর নিজ হাতে হিজ্‌লার অসহায় জনগণের মধ্যে ট্রাকভর্তি খাদ্যশস্য বিলিয়ে দিচ্ছিলো। বনহুরের দেহে এখনও সেই জমকালো পোশাক পরা রয়েছে। মাথায় পাগড়ী, পায়ে ভারী বুট, পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা।

বনহুরকে সহায়তা করে চলেছে রহমান, রামসিং এবং তার অন্যান্য অনুচর। তারা খাদ্যশস্যগুলো তুলে দিচ্ছে বনহুরের হাতে, বনহুর তুলে দিচ্ছে দুঃস্থ জনগণের হাতে। অপূর্ব এ দৃশ্য—কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা, কত জীর্ণদেহ প্রৌঢ়, কত রোগকাতর নারীপুরুষ সবাই এগিয়ে আসছে একের পর এক করে। বনহুর সবাইকে পরিমাণমত খাদ্য দান করে যাচ্ছে।

জনগণের আনন্দ যেন ধরছে না।

পুলকিত সবার মন, হাসিতে ভরপুর সবার মুখ। ওরা আঁচল ভরে খাবার নিয়ে যাচ্ছে, পেট পুরে আজ খেতে পাবে।

জম্বুর রাজকন্যা। ঐ মুহূর্তে সেই পথে পাল্কীযোগে কোথাও যাচ্ছিলো। সে বহু লোকজনকে সেখানে ভীড় হতে দেখে পাল্কী চালকগণকে পাল্কী থামাতে বললো। রাজকন্যার আদেশ না মেনে উপায় নেই কাজেই পাল্কী চালকগণ পাল্কী থামিয়ে ফেললো।

ঐ সময় কয়েকজন দুঃস্থ লোক পুঁটলি করে কিছু দ্রব্য নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো।

রাজকন্যা পাল্কী থেকে মুখ বের করে একজনকে জিজ্ঞাসা করলো—ওগো, শোন তোমাদের পুঁটলিতে কি আছে? আর ওখানে অতো ভীড়ইবা কেন?

তখন এক বুড়ী বললো—তুমি জানো না বুঝি?

না তো।

ওখানে একজন দাতা এসেছে সে সবাইকে খাদ্যদ্রব্য বিলিয়ে দিচ্ছে। বড় দয়ালু, বড় মহৎ সে।

হঠাৎ রাজকন্যা ইশরাৎ জাহানের মনে নতুন এক সখ চাপলো, সে বেয়ারাদের পাল্কী নামিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলো।

বেয়ারাগণ পাল্কী নামিয়ে রাখলো।

রাজকন্যা বললো—আচ্ছা বুড়িমা, তোমার কাপড় আর বোরখানা আমাকে দেবে? আমি যা খাদ্যদ্রব্য পাবো নিয়ে এসে তোমাকে অর্ধেক দিয়ে দেবো।

বুড়িমার চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—তাইতো, এতোগুলো খাদ্যদ্রব্য পেয়েছে আরও যদি কিছু পায় মন্দ কি! বললো বুড়িমা—আমি আমার কাপড় তোমাকে পরতে দেবো কিন্তু আমি পরবো কি?

যতক্ষণ আমি ফিরে না আসি ততক্ষণ তুমি আমার পোশাক পরে এখানে এই পাল্কীতে বসে থাকবে, আমি ফিরে এসে তোমার কাপড়চোপড় ফিরিয়ে দেবো।

আচ্ছা তাই করো মা, তাই করো।

বুড়িমা জিনিস পাবে সেইজন্য খুশিতে আত্মহারা, তাই সে কোনো কথা জিজ্ঞাসাও করলো না।

বেয়ারাগণকে আড়ালে সরে যেতে বলে রাজকন্যা বুড়ির জামাকাপড় খুলে নিয়ে নিজে পরে নিলো এবং তার রাজকীয় পোশাক পরিয়ে দিলো বুড়িমাকে। বুড়িমা পাল্কীর মধ্যে চুপচাপ বসে রইলো।

রাজকন্যা ছেঁড়া তালিযুক্ত কাপড় পরে বোরখায় দেহটা ঢেকে নিলো, তারপর এগিয়ে চললো সে ঐ ভীড় লক্ষ্য করে। ভীড়ের চাপে যদিও তার খুব কষ্ট হলো তবু সে এক সময় পৌঁছে গেলো জমকালো পোশাকপরা বনহুরের পাশে।

দূর থেকেই ইশরাৎ জাহান বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করছিলো, কে এই ব্যক্তি যার কার্যকলাপ এবং চেহারা সবই অপূর্ব, অদ্ভুত। নিকটে পৌঁছে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো। বোরখার মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে তার চোখ দুটো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর একাগ্রচিত্তে খাদ্যসম্ভারগুলো দুঃস্থ জনগণের হাতে তুলে দিচ্ছিলো, হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো বোরখা পরিহিতা বৃদ্ধাবেশিনী রাজকন্যার উপর। বনহুর আশ্চর্য হলো, সবাই যখন খাদ্যদ্রব্য নেবার জন্য ব্যাকুলভাবে ঠেলাঠেলি করে এগুচ্ছে, তখন বোরখা পরিহিতা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর তাকে ডাক দিয়ে বললো—এসো বুড়িমা, নিয়ে যাও। ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কিছু নিতে পারবে না।

এবার রাজকন্যা ইশরাৎ জাহান সম্বিৎ ফিরে পেলো, সে নিজেই লজ্জিত হলো। কিন্তু লজ্জার চেয়ে বেশি সে মুগ্ধ হলো জমকালো পোশাকপরা লোকটার কণ্ঠস্বর শুনে, কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লো রাজকন্যা ইশরাৎ জাহান। এগিয়ে এসে দু'হাত বাড়ালো খাদ্যদ্রব্যের পুঁটলিটা নেবার জন্য।

বনহুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এসে পড়লো বোরখা পরিহিতার দু'টি হাতে। আশ্চর্য হলো বনহুর হাত দু'খানা কোনো বৃদ্ধার হাত হতে পারে না। আরও বিস্মিত হলো সে, বৃদ্ধার আংগুলে একটি মূল্যবান হীরার আংটি ঝক্‌মক্ করছে।

রাজকন্যা ইশরাৎ জাহান তাড়াতাড়ি তার পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তনে সময় আংগুল থেকে হীরার আংটিটা খুলবার কথা সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলো।

বনহুর খাদ্যসম্ভার তুলে দেবার সময় বোরখা পরিহিতাকে মোটেই বুঝতে দিলো না যে, সে কোনোরকম সন্দেহ করেছে। বোরখা পরিহিতা খাদ্যদ্রব্যগুলো নিয়ে চলে গেলো ভীড় ঠেলে।

বনহুর রহমানের হাতে খাদ্যদ্রব্যগুলো বিতরণের দায়িত্ব ভার অর্পন করে বেরিয়ে গেলো ভিড়ের বাইরে। ভিড় ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো বেশ কিছু দূরে একটি ঝোপের আড়ালে একটা পাল্কী রয়েছে।

বোরখা পরিহিতা ঐ পাল্কীখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাল্কীখানা যেখানে রয়েছে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে সেই পাল্কীর অদূরে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। সেখান থেকে পাল্কীখানা স্পষ্ট নজরে পড়ছে। পাল্কীর মধ্যে কেউ রয়েছে বলে মনে হলো বনহুরের।

বোরখা পরিহিতা পাল্কীর পাশে এসে দাঁড়াতেই পাল্কীর বেয়ারাগণ সরে গেলো দূরে। পাল্কীর ভিতর হতে নেমে দাঁড়ালো এক বৃদ্ধা, তার দেহে রাজকীয় পোশাক। বৃদ্ধা পাল্কী থেকে নেমে নিজ দেহের বসন ত্যাগ করলো, বোরখা পরিহিতা তখন বোরখা খুলে ফেলেছে।

বিস্মিত হলো বনহুর।

যে বোরখা পরিহিতা বৃদ্ধা কিছু পূর্বে তার নিকটে গিয়ে হাত পেতে সাহায্যদ্রব্য গ্রহণ করলো সে এক অতি সুন্দরী তরুণী। অপূর্ব তার রূপযৌবন। যে কোনো দৃষ্টিকেই অতি সহজে সে সৌন্দর্য আকৃষ্ট করে। বনহুরও মুগ্ধ হলো, কে এই তরুণী যে ভিখারিণীর বেশে তার সম্মুখে হাজির হয়ে সাহায্য দ্রব্য গ্রহণ করেছিলো।

বনহুর আরও অবাক হলো বৃদ্ধা ভিখারী ড্রেস পরিবর্তন করে রাজকন্যার ড্রেস পরিধান করে নিলো সে। তারপর বৃদ্ধাকে তার নিয়ে যাওয়া সাহায্যদ্রব্যের পুঁটলিটা দিয়ে বললো—নিয়ে যাও এগুলো।

বৃদ্ধা ভিখারী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বললো—সবগুলোই আমাকে দিলে মা?

হাঁ, আমি সব তোমাকে দিলাম, তুমি নিয়ে যাও বুড়ি মা।

বৃদ্ধা খুশি হয়ে নিজের পুঁটলি এবং রাজকন্যার দেওয়া পুঁটলি নিয়ে রাজকন্যাকে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেলো।

রাজকন্যা তখন পাল্কীতে চেপে বসেছে।

বনহুর মুহূর্তে বিলম্ব না করে ওপাশে দন্ডায়মান একজন বেয়ারাকে অন্যান্য বেয়ারার অলক্ষ্যে টেনে সরিয়ে নিলো এবং তার মুখে রুমাল গুঁজে দিয়ে তার দেহের পোশাক খুলে নিয়ে পরে নিলো নিজের দেহে। বেয়ারাটিকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখলো ঝোপটার আড়ালে।

ওদিকে তিনজন বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে পাল্কীটার পাশে কিন্তু আর একজন কই? ওরা ডাকাডাকি শুরু করে দিলো।

এমন সময় এগিয়ে এলো বনহুর বেয়ারার বেশে। বললো—ভাই, তোমরা কাকে ডাকছো?

আমাদের একজন কোথা চলে গেলো তাকে খুঁজে পাচ্ছি না, তাকেই ডাকছি।

বললো বনহুর—ও, তাইতো ওদিকে একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম। মনে হলো কোনো একজন লোককে বাঘ ধরেছে। তাহলে সেই লোকটা বুঝি তোমাদেরই সঙ্গী?

সত্যি বাঘ ধরেছে? বললো একজন বেয়ারা।

হাঁ, সত্যি ভাই সব সত্যি! তোমরা শিগ্‌গির পালাও। পালাও বলছি......বাঘটা এদিকে আসতে পারে।

কিন্তু আর একজন নাহলে কি করে তিনজন মিলে পাল্কী উঠাবো। এসোনা ভাই তুমি আমাদের সঙ্গে, রাজকন্যা তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

দু'চোখ কপালে তুলে বলে বেয়রাবেশী বনহুর—রাজকন্যার পাল্কী এটা, বলো কি!

হাঁ ভাই, জম্বুর রাজকন্যা। এ পাল্কীতে রয়েছেন। এসো ভাই আমাদের সঙ্গে।

বেশ চলো কিন্তু পুরস্কার পাবো তো?

নিশ্চয়ই পাবে।

বনহুর এসে যোগ দিলো পাল্কীবাহকদের সঙ্গে।

পাল্কীতে বসে রাজকন্যা সব শুনলো কিন্তু ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ায় সে কোনোরকম কথা বলতে পারলো না। নিজকে বড় অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো তার। কেন সে নিজে পাল্কী নামাতে বলেছিলো, নাহলে একজন বেয়ারাকে বাঘে খেতো না। বেচারীর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে, তাদের এখন কি অবস্থা হবে? দুঃখে তার দু'চোখে পানি এলো। কিন্তু সব ছাপিয়ে দুটি চোখ, দু'টি ভ্রু, প্রশস্ত একটি ললাট তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। একটি কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি বারবার তার হৃদয়ে শিহরণ জাগাচ্ছিলো। কে ঐ ব্যক্তি যার এত দয়া......

ইশরাৎ জাহান যতই ভাবছে ততই মুগ্ধ অভিভূত হচ্ছে। সমস্ত মন জুড়ে একটি ছবি ভাসছে জমকালো পোশাক পরা একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে উঁচু

একটি টিলার উপর। নিচে অগণিত দুঃস্থ জনগণ দু'হাত বাড়িয়ে আছে তার দিকে। অসংখ্য খাদ্যসম্ভার জমকালো মূর্তি তুলে দিচ্ছে তাদের হাতে। তারা পরম আনন্দে ফিরে যাচ্ছে যে যার ঘরে।

ফিরে এলো ইশরাৎ জাহান জম্বু রাজ প্রাসাদে। বেয়ারার বেশে বনহুরও পৌঁছলো সেখানে। বনহুর বিস্মিত হয়ে গেলো, কারণ রাজকন্যা গিয়েছিলো তার সম্মুখে ভিখারিণী বেশে—সাহায্য গ্রহণ করতে। কি উদ্দেশ্য তার, সাহায্যদ্রব্য গ্রহণ করে সেগুলো আবার দান করলো সে বৃদ্ধা ভিখারিণীর হাতে। অপূর্ব রাজকুমারী ইশরাৎ জাহানের মন। বনহুর হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করলো।

রাজকন্যা ইশরাৎ জাহান প্রাসাদে পৌঁছে অসময়ে উপকারী ব্যক্তিটিকে চট করে বিদায় দিলো না। সে নিজে তাকে ডেকে পাঠালো রাজ-অন্তঃপুরের সিংহদ্বারে।

বনহুর তখন চিঁড়াগুড় চিবুচ্ছিলো।

একজন এসে বললো—তোমাকে রাজকন্যা ডাকছেন।

এ্যাঁ, আমাকে রাজকন্যা ডাকছেন, বলো কি ভাই।

হাঁ, সত্যি বলছি।

বনহুর ততক্ষণে চিড়াগুড় খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে, বললো—আজ নয় আবার যেদিন আসবো সেদিন রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করবো।

যে লোকটা বনহুরকে ডাকতে এসেছিলো সে বলে উঠে—তুমি বড্ড হতভাগা নাহলে এমন কথা বলতে না। রাজকন্যা তোমাকে ডাকছেন এ যে তোমার পরম সৌভাগ্য। তাছাড়া তুমি পুরস্কার নেবে না?

নেবো কিন্তু আজ নয়। যেদিন পুরস্কার নেওয়া দরকার মনে করবো সেইদিন নেবো, আজ চললাম। বনহুর বেরিয়ে গেলো রাজপ্রাসাদ থেকে।

যে লোকটা রাজকন্যার নির্দেশ অনুযায়ী ওকে ডাকতে এসেছিলো সে বিমুখ হয়ে ফিরে গেলো। রাজকন্যা এক হাজার টাকার একটি থলে হাতে অপেক্ষা করছিলো। রাজকর্মচারী ফিরে এসে তাকে বললো—রাজকুমারী, সে চলে গেছে।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো রাজকুমারী—চলে গেছে!

হাঁ।

কেন, সে কি পুরস্কার নেবে না?

নেবে কিন্তু আজ নয়, যেদিন তার প্রয়োজন হবে সেদিন সে পুরস্কার নিতে আসবে।

আপন মনে বলে উঠলো ইশরাৎ জাহান—বড় আশ্চর্য লোক তো সে!

হাঁ রাজকুমারী, লোকটা বড় আশ্চর্যই বটে।

আচ্ছা তুমি যাও।

সে চলে গেলো।

রাজকন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো।

একসময় ভুলে গেলো সে লোকটির কথা। কিন্তু ভুললো না সে ঐ লোকটিকে যে অগণিত দুঃস্থ মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে দান করে চলেছে।

বনহুর ফিরে এলো সেই স্থানে।

ঝোপের পাশে তখন পড়ে আছে বেয়ারাটি। হাত-পা এবং মুখ বাঁধা থাকায় সে উঠে দাঁড়াতে পারেনি বা চিৎকার করতে পারেনি।

বনহুর এসে তার হাত-পা এবং মুখের বাঁধন খুলে দিলো, তারপর নিজ পোশাক পরে নিয়ে বেয়ারার পোশাক দিলো ওর হাতে।

বেয়ারা পোশাক পরে নিলো, সে অবাক হয়ে গেছে সে এই লোক যে তাকে এভাবে হাত-পা বেঁধে গেলো, আবার ফিরে এসে তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিলো। বনহুর তার জমকালো পোশাকের মধ্য থেকে বের করলো একটি থলে। থলেটা বেয়ারার হাতে দিয়ে বললো—এই নাও এতে কিছু টাকা আছে নিয়ে যাও।

লোকটা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে, একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

বনহুর চলে গেলো।

লোকটা আনন্দে আত্নহারা হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর চলে যাওয়া পথের দিকে। ও চলে যেতেই লোকটা টাকার থলি হাতে দ্রুত ফিরে চললো রাজপ্রাসাদ অভিমুখে।

বেয়ারা রাজপ্রাসাদে পৌঁছতেই সবাই অবাক হয়ে গেলো, কারণ বেয়ারাটিকে বাঘে খেয়েছে বলেই সবাই জানতো। যে তিনজন বেয়ারা ছিলো তারা ছুটে এলো এবং তাকে ঘিরে ধরে নানা রকমভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। সবাই তার দেহে ক্ষত না দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললো—বাঘ তোমাকে ধরে নিয়ে গেলো অথচ তোমার শরীরে একটিও ক্ষতচিহ্ন নেই, ব্যাপার কি?

বেয়ারা অবাক হয়ে বললো—কই আমাকে তো বাঘ ধরেনি, ধরেছিলো মানুষ। কিন্তু জানো মানুষ নয় সে ফেরেস্তা, আমাকে একটি টাকার থলে দিয়েছে। থলের টাকা গুণে দেখি এক হাজার টাকা তাতে রয়েছে।

সবাই বিস্ময়ে হতবাক।

অপর তিনজন বেয়ারা তখন তাকে রাজকন্যা ইশরাৎ জাহানের সম্মুখে নিয়ে গেলো। সব শুনে রাজকন্যা বিস্ময়ে থ' বনে গেছে। সে ভাবছে যে লোকটা তার পাল্কীবাহকদের সঙ্গে পাল্কী বহন করে আনলো তবে কি সেই লোকই বেয়ারাকে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখে এসেছিলো? কি উদ্দেশ্য ছিলো তার এর পিছনে? এখানে এসেও সে কোনো পুরস্কার গ্রহণ না করেই চলে গেলো। শুধু তাই নয়, বেয়ারাটিকে এক হাজার টাকা সে থলে সহ দান করেছে। কে সে মহৎ ব্যক্তি......রাজকন্যা যত ভাবে ততই যেন অবাক হয়ে যায়। ভাবনার কোনো সমাধান হয় না।

রাজকন্যা ইশরাৎ জাহান যখন গভীরভাবে এসব নিয়ে চিন্তা করছিলো তখন তার সখী হাস্‌নাবানু এসে জানালো—ইশরাৎ, শুনেছো একটা কথা?

কি কথা হাস্‌না?

ক'দিন আগে শুনলাম হিপ্পি নামক একটা জাহাজ কে বা কারা আটক করে তার সমস্ত মাল জম্বু পর্বতের কোনো গোপন স্থানে গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহলে ব্যস্ততার অন্ত ছিলো

না। আবার শুনলাম, গত পরশু ইরামতী নদীতীরে কে বা কারা একনৌকা মাল জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়।

তারপর? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো রাজকন্যা ইশরাৎ জাহান।

পুলিশ বাহিনী দানকার্যে রত ব্যক্তিদের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে ফেলে এবং তাদের বন্দী অবস্থায় পুলিশ ভ্যানে করে জম্বু অভিমুখে রওয়ানা দেয়।

তারপর?

পথিমধ্যে জম্বু জঙ্গলের পাশে একদল দুস্কৃতিকারী হামলা দিয়ে পুলিশ বাহিনীর কবল্ থেকে ঐ লোক দু'জনকে উদ্ধার করে নেয় এবং তাদের সঙ্গে ছিলো একট্রাক খাদ্যদ্রব্য—সব তারা ছিনিয়ে নেয়......

তারপর কি হলো হাস্না?

গতকালকের পত্রিকায় দেখলাম দুস্কৃতিকারী ট্রাকভর্তি খাদ্যদ্রব্যগুলো পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হিজলার কোনো এক নির্জন স্থানে হিজলার দুঃস্থ জনগণকে জমায়েত করে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছে। সত্যি বড় আশ্চর্য লাগছে ইশরাৎ জাহান, কারা এরা যারা এমন কাজ করছে.........

আমিও বিস্মিত হয়েছি হাস্না, কারণ আমি নিজে দেখে এসেছি কে সে মহাপুরুষ যে নিজ হাতে গরিব দুঃস্থ জনগণের মধ্যে রাশিকৃত খাদ্যদ্রব্য বিলিয়ে দিচ্ছে.........

ইশরাৎ তুমি সেই দুস্কৃতিকারীকে মহাপুরুষ বলছো?

হাঁ হাস্না মহাপুরুষই বটে। সে কে জানি না, তবে সে যে শুধু মহাপুরুষই নয়, একজন তেজোদ্দীপ্ত বীর পুরুষও তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইশরাৎ, তুমি এতদূর দেখেছো?

হাঁ হাস্না, আমি নিজ চোখে তাকে দেখেছি। গত পরশু আমি যখন সাধারণভাবে একটি পাল্কীতে চেপে নগরের বাইরে হিজলা পল্লীতে গিয়েছিলাম তখন হঠাৎ আমার নজরে পড়লো হিজলার অদূরে নির্জন

বনভূমির ধারে অসংখ্য গরিব-দুঃখী ভিড় করে কিছু নিচ্ছে। আমার বড় সখ হলো ব্যাপার কি জানার জন্য। আমি জানতাম কোনো চোর-ডাকু-বদমাইশ আমার পরিচয় পেলে আমার পালকীর উপর হামলা করবে না। তাই আমি সাহসে নির্ভর করে পাল্কী নামাতে বললাম।

সত্যি ইশরাৎ, তুমি বড় ভুল করেছিলে। যদি কোনোরকম বিপদ-আপদ ঘনিয়ে আসতো?

আমি জানতাম কোনো বিপদ-আপদ আসবে না। তাছাড়া আমার অভ্যাস ছিলো, কারণ আমি প্রায়ই জম্বুর গ্রামাঞ্চলে পাল্কী ভ্রমণে যেতাম।

যা হোক, এবার বলো তুমি সেদিন কি দেখেছিলে? কারণ আমি একটু আধটু যা শুনেছি বা আমার কানে গিয়েছে তাতে মনে হয় তুমি পুলিশকে সঠিক সংবাদ জানাতে পারবে।

হাস্না, তুই একি কথা বলছিস্? যে বা যারা এসব দ্রব্য গরিব জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেয় সেকি মন্দ লোক বা দুস্কৃতিকারী হতে পারে? নিশ্চয়ই মহৎ ব্যক্তি হবে......

ইশরাৎ, তুমি জানো না পুলিশমহল কত তৎপর হয়ে উঠেছে তাঁদের গ্রেপ্তার করার জন্য, অহঃরহ গোয়েন্দা বিভাগ সজাগভাবে সন্ধান করে ফিরছে, ওদের গ্রেপ্তার করতে পারলে মোটা টাকা বখশীস ঘোষণা করেছে সরকার।

এত কথা তুই জানিস কি করে?

আমি কেমন করে জানলাম পরে বলছি, তুমি কি দেখেছো বলো? যদি প্রয়োজন হয় বাবার বন্ধু মন্ত্রী বাহাদুর জামান উদ্দিন আসবেন তোমার কাছে.........

মুহূর্তে মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো ইশরাৎ জাহানের। বললো সে— হাস্না, আমি এত নীচ বা হৃদয়হীন নই যে, মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে আমি যা দেখেছি বলবো। এমন কি তোর কাছেও আমি একটি কথাও বলবো না।

হাস্না বললো—তুমি জানো না বলেই ওদের সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ করছো। এই দুস্কৃতিকারীরা দেশে সমস্ত আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করেছে।

না, দুস্কৃতিকারী এরা নয়—আমি বিশ্বাস করি না।

যেদিন ওরা তোমার ঘরে হামলা চালাবে সেদিন বুঝবে, সেদিন ভুল ভাঙ্গবে তোমার। হাস্না কথাগুলো বলে চলে যায়।

ইশরাৎ জাহানের চোখের সম্মুখে তখন ভাসছে সেই দিনের সেই দৃশ্যটি...জমকালো পোশাকপরা একটি লোক দু'হাত ভরে দান করে চলেছে। অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ, প্রশস্ত একটি ললাট, একজোড়া গভীর কালো ভ্রু। দু'হাত বাড়িয়ে আছে ইশরাৎ জাহান, জমকালো পোশাকপরা লোকটি তার হাতে খাদ্যসম্ভার তুলে দিচ্ছে.........

ইশরাৎ জাহান যতই ভাবে ততই যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে, তাঁর সমস্ত মন জুড়ে ঐ দৃশ্যটিই ভাসতে থাকে। ইশরাৎ জাহানের জীবনে এমন মুহূর্ত আসেনি কোনোদিন। ঐ মুহূর্তটি তার জীবনে একটি পরম সম্পদ বলে মনে হয় তার।

❑

সর্দার!

কে রহমান?

হাঁ সর্দার, আমি।

হঠাৎ কি মনে করে এলে?

সর্দার, কান্দাই শহরের আস্তানা থেকে আমাদের প্রমাণ অনুচর মোহসিন আলী জানিয়েছে দিপালীর সন্ধান নাকি তারা পেয়েছে।

বলো কি রহমান?

হাঁ সর্দার।

কি সংবাদ পাঠিয়েছে মোহসিন?

কান্দাই থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে কোনো একটা সরাইখানায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাকে আটক করে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হচ্ছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল ভীষণ কঠিন আকার ধারণ করলো, দাঁতে দাঁত পিষে বললো—শয়তানদল তাহলে তাকে জীবিত রেখে তার উপর অত্যাচার চালাচ্ছে?

হাঁ সর্দার, মোহসিন আলী আরও জানিয়েছে অচিরে তাকে মুক্ত করে না আনলে সে নাও বাঁচতে পারে। সর্দার, মোহসিন আলী আরও জানিয়েছে, যে ব্যক্তি এখন দিপালীকে আটক করে তাকে নির্যাতিত করছে সে নাকি চল্লিশটা কুকুরের মালিক—তার নাম ইমরান।

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো বনহুর—ইমরান!

শুধু ইমরান নয়, ইমরানের সঙ্গে আরও একটা কিছু যোগ আছে।

হুঁ সেই রকমেই হবে। রহমান?

বলুন সর্দার?

দিপালীকে উদ্ধার করাই আমার প্রথম কাজ, তাই না?

হাঁ সর্দার, কারণ সে যেভাবে আপনাকে সহায়তা করেছিলো...

শুধু সে কারণেই নয়, একটা নিরীহ মহিলার প্রতি নির্মম অকথ্য অত্যাচার চলছে, এর একটা প্রতিকার করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শয়তানদলটি কারা—তাদের কি কাজ এটাও আমার বিশেষভাবে জানা দরকার। রহমান, আমি আব্বাস হাজারীর কাছে থেকে যে সব মহান ব্যক্তির নাম সংগ্রহ করেছি তাঁদের শায়েস্তা করার সময় এখনও আসেনি।

সর্দার, তারা কারা জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারবে কিন্তু আজ নয়। তবে জেনে রাখো তাঁরা হলেন দেশের হর্তকর্তা স্থানীয় মহান নেতা নামধারী ব্যক্তি— যাদের নেতৃত্বে দেশ চলছে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে যারা দুষ্কৃতিকারী দমনের জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন। যাঁরা দেশের জনগণের দুঃখে মঞ্চে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ

মুছেন......রহমান, আমি তাদের কাউকে ক্ষমা করবো না। ক্ষমা করবে না দেশের জনগণ, কারণ তারাই দেশের এই চরম অবস্থার জন্য দায়ী নিঃসন্দেহে। রহমান, তুমিও কারও কারও নাম জানো?

হাঁ সর্দার, জানি তবে সবার নাম জানি না।

কান্দাই থেকে ফিরে এসে জানাবো।

আপনি কি আজই কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দেবেন সর্দার?

হাঁ, দিপালীর উদ্ধার সর্বপ্রথম আমার কর্তব্য!

বনহুর গম্ভীরভাবে পায়চারী করে চলে।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে রামসিং, সে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে— সর্দার, আপনি নাকি আজই কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা দিচ্ছেন?

হাঁ রামসিং?

সর্দার, আজ একটা নতুন সংবাদ পেয়েছিলাম, সংবাদটা বড় হৃদয়স্পর্শী।

কি সংবাদ?

জম্বুর আশেপাশে কয়েকটি গ্রামে সমস্ত ক্ষেত্রে শস্য হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। সর্দার, দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ক্ষেতের সমস্ত শস্য যদি এভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে দেশের জনগণ কিছুতেই বাঁচবে না......

ভ্রুকুঞ্চিত করে বলে বনহুর— ক্ষেতের শস্য যদি হলুদ বর্ণ হয় তাতে আমার কি করবার আছে রামসিং?

আছে সর্দার।

বলো কি রামসিং?

ক্ষেত্রে শস্য কেন হলুদ বর্ণ হচ্ছে—এর পিছনে রয়েছে বিরাট একটা ষড়যন্ত্র, ভয়ঙ্কর একটা কারসাজি!

কারসাজি?

হাঁ সর্দার। দেশের এই চরম মুহূর্তে একদল ব্যবসায়ী সারের মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে বাজারে ছাড়ছে, যে সার ক্ষেতের শস্যের পক্ষে বিষের মত

কাজ করছে। ক্ষেতে সার দেবার পর পরই ক্ষেতে শস্যাদি হলুদ বর্ণ হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—সারের মধ্যে ভেজাল চলছে?

হাঁ সর্দার, ভেজাল সে অতি মারাত্মক ভেজাল—সারের মধ্যে লবণ ভেজাল চলেছে।

রামসিং, এ তুমি কি বলছো?

সত্যি কথা সর্দার।

যারা এতবড় জঘন্য কাজ করতে পারছে তারা কি মানুষ!

মানুষ নামধারী পশুতো বটেই তবে মানুষই বলা চলে। সর্দার, সারের মধ্যে লবণ মেশানো এটা শিশুহত্যার চেয়েও মহাপাপ......

রামসিং, আজই তুমি এর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করো, আমি কান্দাই থেকে ফিরে এসেই সারের ভেজালকারীদের মূলোচ্ছেদ করবো।

সর্দার, পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে সরকারকে সজাগ দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

অনুরোধ! কে সরকার, কার কাছে অনুরোধ? আর কেই বা সে অনুরোধ শুনবে? রামসিং, অনুরোধ শোনার যদি কেউ থাকতো তাহলে দেশের আজ এ চরম অবস্থা হতো না। ভেজাল শুধু দ্রব্যেই নয়, এ দেশের প্রতিটি মানুষ ভেজালে পরিণত হয়েছে। বাইরের রূপ দেখে কারও ভিতরের খোঁজ পাবে না। কারণ বাইরের একরূপ ভেতরে আর একরূপ। মানুষ নয় রামসিং, সবাই মানুষের মুখোশ পরে এক একজন জীবন্ত শয়তান। রামসিং, তুমি এবং রহমান মিলে গোপনে সন্ধান নাও কারা সেই নরপশু যারা শিশুহত্যার চেয়েও মহাপাপ কার্যে লিপ্ত রয়েছে, সারে লবণ মিশ্রিত করে বাজারে ছাড়ছে। আমি কান্দাই থেকে ফিরে এসে এদের সবাইকে শায়েস্তা করবো।

সেইদিনই বনহুর রওয়ানা দিলো কান্দাই অভিমুখে। রহমান কিংবা রামসিং কাউকেই সঙ্গে নিলো না সে। জম্বু ফিরে এসে অনেক কাজ তাকে সমাধা করতে হবে।

রাত্রি অন্ধকারে বনহুর কান্দাই শহরের আস্তানায় এসে পৌঁছলো।

গভীর রাতে তাজের খুরের শব্দে কান্দাইয়ের বহু লোক জেগে উঠলো। দুষ্ট শয়তান যারা তাদের হৃদয় শিউরে উঠলো। যারা মহৎ ব্যক্তি তাদের মন খুশিতে উছলে উঠলো—সবাই বুঝতে পারলো বনহুর ফিরে এলো কান্দাইয়ে।

মনিরার কানেও তাজের খুরের শব্দ পৌঁছেছিলো। প্রতিদিন সে এমনি কোনো একটা মুহূর্তের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো।

আজ হঠাৎ তার কানে ভেসে আসলো তার পরিচিত অশ্বপদ শব্দ।

উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো মনিরা, তবে কি সত্যি তার স্বামী ফিরে এসেছে!

বনহুর ততক্ষণে পৌঁছে গেছে তার কান্দাই আস্তানায়। সমস্ত অনুচর বিপুল আগ্রহ নিয়ে পথ চেয়েছিলো। সর্দার পৌঁছতেই বিশ্বস্ত অনুচর মোহসিন আলী এসে কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর মোহসিনসহ সুড়ঙ্গপথে ভূগর্ভে নেমে এলো তার বিশ্রামকক্ষে। তাজকে অন্য পথে নিয়ে গেলো দু'জন অনুচর অশ্বশালায়। তাজ যখন দূর থেকে এসে পৌঁছে তখন তাজের সেবাযত্নের জন্য দু'জন অনুচর প্রস্তুত থাকে সর্বক্ষণ। তাজের শরীর যেন কোনোরকম দুর্বল না হয় সেদিকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না অনুচরদের।

বহু পথ অতিক্রম করে এসেছে বনহুর। তার ললাটে ফুটে উঠেছে ঘর্মবিন্দু, যেন এক একটি মুক্তার মত। সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

ভূগর্ভের পাষাণ কক্ষের দেয়ালস্থ মশালের আলোতে অদ্ভুত লাগছে বনহুরকে।

বনহুর মাথার পাগড়ীটা খুলে টেবিলে রেখে পায়চারী করতে লাগলো। তার দেহের জমকালো পোশাকটাও মশালের আলোতে যেন জ্বলছে। ভারী বুটের প্রতিধ্বনি হচ্ছে পাথুরে মেঝেতে।

একপাশে দাঁড়িয়ে মোহসিন আলী। সে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে সে সর্দারকে। হঠাৎ নিজে কিছু বলার সাহস হচ্ছে না, সর্দার প্রশ্ন না করা পর্যন্ত কিছু বলতেও পারছে না সে।

বনহুর বেশ কয়েক মিনিট পায়চারী করে নিয়ে বললো— মোহসিন আলী, তুমি যে সংবাদ পাঠিয়েছিলে তার কতদূর অগ্রসর হয়েছো?

আমাদের একজনকে সেখানে পাহারায় রেখেছি সর্দার, যেন দিপালীকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে না পারে কিংবা সরিয়ে ফেললেও যেন আমরা তাকে খুঁজে পাই।

হাঁ, বুদ্ধিমানের কাজ করেছো মোহসিন। দিপালীর সন্ধান কি করে পেলে এবার বলো?

সর্দার, আমাদের অনুচর জাফর দিপালীর প্রথম সন্ধান পেয়েছিলো।

কোথায় সে?

আছে সর্দার।

তাকে ডাকো।

মোহসিন আলী বেরিয়ে গেলো এবং একটু পরে ফিরে এলো, সঙ্গে তার জাফর।

জাফর কুর্ণিশ জানালো সর্দারকে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলো জাফরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপর বললো—জাফর, বলো দিপালীর সন্ধান তুমি কেমন করে পেলে?

সর্দার, আমরা আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কান্দাই শহরের প্রতিটি স্থানে নানাভাবে দিপালীর সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলাম। শুধু আমরা নই, পুলিশমহলও দিপালীর সন্ধানে সমস্ত শহর খুঁজে ফিরছে।

হাঁ, সে কথা আমি জানি। তুমি কিভাবে সন্ধান পেলে তাই বলো?

সর্দার, তাই বলছি। সেদিন আমি একটা সরাইখানায় বসে ঠান্ডা পানীয় পান করছি, এমন সময় একটা কালো বিরাট মোটরগাড়ি এসে থামলো সেই সরাইখানার সম্মুখে। তখন বেশ রাত হয়েছে, আমি ঐ সরাইখানায় রাত কাটাবো বলেই মনস্থির করে বসে ছিলাম। গাড়িখানা যেমন বিরাট আকার তেমনি জমকালো। গাড়ির কোনো দরজা-জানালা নেই। আমি অবাক হয়ে দেখছি কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছি অন্যদিকে, কেউ যেন বুঝতে না পারে আমি গাড়িখানা লক্ষ্য করছি।

হাঁ, তারপর?

সর্দার, সে এক বিস্ময়পূর্ণ কাহিনী!

হুঁ, বলো?

জমকালো গাড়ি থেকে এক ব্যক্তি নেমে এলো। লোকটা যেন একটা জীবন্ত শয়তান। মাথায় লম্বা চুল, মাঝখানে খানিকটা চকচকে টাক, লম্বা এক জোড়া গোঁফ বাদুড়ের লেজের মত ঝুলছে, কান দুটো অসম্ভব রকমের খাড়া যেন খরগোশের কান। দেহটা খুব মোটা না হলেও ভীষণ শক্তিশালী মজবুত দেহ তা বেশ বুঝা যায়। দামী স্যুট পরা, মুখে চুরুট ফুঁকছে। লোকটা গাড়ি থেকে নামতেই সরাইখানার মালিক তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালো। লোকটার নাম ইমরান বুঝতে পারলাম—সরাইখানার মালিক একবার তাকে ঐ নামে সম্ভাষণ করলেন। ইমরান সরাইখানার সম্মুখের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেও সরাইখানার অপর কোনো দরজা রয়েছে বুঝতে পারলাম। কারণ জমকালো বড় গাড়িখানার পিছনে একটি দরজা ছিলো ঐ দরজা খুলে দিতেই প্রায় চল্লিশটা কুকুর বেরিয়ে এলো গাড়ি থেকে। ইমরান ইংগিত করতেই কুকুরগুলো নেমে সরাইখানার পিছনের দিকে কোনো দরজা দিয়ে চলে গেলো ভিতরে। এরপর ঐ গাড়ি থেকেই নামানো হলো একটি পাগলিনী প্রায় তরুণীকে।

বনহুর দাঁড়িয়ে থেকে কথাগুলো শুনছিলো, এবার সে একটা আসনে দেহটা এলিয়ে দেয়।

জাফর বলে চলেছে—পাগলিনীপ্রায় তরুণীটিকে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামানো হলো এবং ইমরানের ইংগিতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হলো কুকুরগুলোকে যে পথে নিয়ে গিয়েছিলো সেই পথে।

তারপর আর কি দেখলে?

দেখলাম একটু পরে ইমরান চলে গেলো সেই পথে।

তুমি কেমন করে বুঝলে সেই তরুণীই দিপালী?

সর্দার, ইমরানই সরাইখানার মালিকের কাছে কিছু বলছিলো তখন আমার কানে এসেছিলো। দিপালীর নামটা দু'তিন বার সে উচ্চারণ করলো। তাতেই মনে হলো সে দিপালী ছাড়া কেউ নয়।

হাঁ বুঝলাম।

সর্দার দিপালীকে ওরা এমন অবস্থায় রেখেছে যা বর্ণনাতীত।

তা বেশ বুঝা যাচ্ছে জাফর এবং আমি সে কারণেই এসেছি। দিপালীকে উদ্ধার করাই আমার প্রথম কাজ। মোহসিন আলী?

বলুন সর্দার।

জাফরের সঙ্গে গিয়ে তুমি সেই সরাইখানার পথ দেখে এসো এবং একটা ম্যাপ এঁকে নিয়ে এসো কোন্ পথ ধরে আমি সেখানে যাবো।

আচ্ছা সর্দার।

বেশ যাও।

বেরিয়ে যায় মোহসিন আলী এবং জাফর। যাবার সময় পুনরায় বনহুরকে ওরা কুর্ণিশ জানাতে ভুলে না।

ওরা চলে যেতেই বনহুর শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। চীৎ হয়ে শুয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো—এলোমেলো নানা চিন্তা এসে ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথার মধ্যে। মনে পড়লো মনিরার কথা। অমনি রিসিভার তুলে নিলো হাতে, ফোন করলো সে চৌধুরী বাড়িতে।

মনিরার কক্ষের টেবিলে ফোন বেজে উঠলো। একটানা শব্দ হচ্ছে ক্রিং ক্রিং ক্রিং......

সমস্ত রাত ঘুমায়নি মনিরা, সবেমাত্র সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে ঘুম ভেঙ্গে যায় নূরের। সে মাঝের দরজা দিয়ে ঘরে এসে রিসিভার তুলে নেয়। এত রাতে কে ফোন করেছে কে জানে।

নূর রিসিভার তুলে নিতেই শুনতে পেলো একটি পুরুষ কণ্ঠ স্বর......হ্যালো মনিরা......কেমন আছো তুমি......

পুরুষ কণ্ঠ শুনেই নূর কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গেলো, গভীর রাতে কে এই লোক তার মাকে ফোন করেছে। নিশ্চয়ই মায়ের পরিচিত ব্যক্তি তাতে

কোনো ভুল নেই। নূর ইচ্ছা করেই কোনো কথা বলে না, সে রিসিভার কানে ধরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ভেসে আসে সেই কণ্ঠস্বর......কথা বলছো না কেন... বুঝেছি অভিমান করেছো......লক্ষীটি রাগ করোনা......সময় পেলেই আসবো......কই, কথা বলছো না যে......

নূর এবার পারে না নিশ্চুপ থাকতে, বলে উঠে সে...... কে আপনি এত রাতে আমার মায়ের কাছে ফোন করছেন...বলুন কে... কে আপনি......

বনহুর হঠাৎ নিজকে সামলে নিতে পারলো না, সে ভাবতেও পারেনি এত রাতে নূর জেগে আছে আর সে ফোন ধরবে।

ওদিকে নূরের কণ্ঠস্বরের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় মনিরার, তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে বলে—নূর, কে ফোন করেছে বাবা?

গম্ভীর কণ্ঠে বলে নূর—জানি না! সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার রেখে দেয় সে, তারপর বলে উঠে—আম্মি, এত রাতে কে তোমার কাছে ফোন করেছিলো আর করবার সাহসই বা পেলো সে কি করে? বলো আম্মি কে সে?

কি বলেছিলো ফোনে?

যা বলেছিলো তা কোনো ভদ্রলোক কোনো অচেনা ভদ্রমহিলাকে বলতে পারে না।

মনিরা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে পুত্রের মুখের দিকে। কিশোর নূরকে আজ তার কাছে অনেক বড় বলে মনে হয়। নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না মনিরা, মাথা নিচু করে নেয় সে।

মনিরা নিশ্চুপ থাকায় নূর চলে যায় তার ঘরে। এত রাতে মায়ের কাছে কে ফোন করেছিলো, এ চিন্তা তাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে।

মনিরা ভাবছে, কে ফোন করেছিলো, তবে কি তার স্বামী? হাঁ, ঘুমের ঘোরে সে যে আজ শুনতে পেয়েছিলো তাজের খুরের শব্দ। নিশ্চয়ই সে কান্দাই এসেছে, হয়তো তাকে ফোন করেছিলো কিন্তু কি এমন কথা বলেছিলো যা নূরকে ভাবিয়ে তুলেছে। নূর এমন পূর্বের সেই শিশুটি নেই

যে, একথা সে কথা বলে তাকে ভুলানো যাবে। লেখাপড়ায় যেমন সে, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধিতেও পাকা। এত অল্প বয়সে এত বেশি পড়াশোনা করেছে কেউ তাকে দেখলে ভাবতেই পারে না যেন। মনিরার মনে পড়ে, যেদিন নূর জন্মগ্রহণ করেছিলো সেদিনের কথা। এই তো ক'বছর আগের ঘটনা... প্রথম পরিচয় মনিরের সঙ্গে। এসেছিলো সে তার আংগুল থেকে হীরক অংগুরিটা চুরি করতে কিন্তু পারেনি, রেখে গিয়েছিলো সে একটি চিঠি। মনিরা আজও সেই ক্ষুদ্র চিঠিখানা যত্ন করে তুলে রেখেছে। সেদিন কি সে জানতো একদিন সেই দস্যু বনহুর তার স্বামী হবে......পরিচয়...তারপর বিয়ে, বিয়ের পর সে মা হলো...... যেন হঠাৎ নিজের অজান্তেই মা হয়েছে মনিরা ......তারপর কত ঘটনাই না ঘটে গেছে তার জীবনে...মনিরা যেন দিন দিন হাঁপিয়ে উঠছে। নূর যত বড় হচ্ছে ততই যেন বেশি অস্বস্তি বোধ করছে। সব সময় ওর নানা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়। কতই বা বয়স হয়েছে নূরের, এই বয়সেই সে তার মাকে বলে আব্বু বাড়ি থাকে না বলে তুমি যা তা করতে পারোনা মা...... তবে কি নূর তাকে কিছু সন্দেহ করে......আর করবেই না বা কেন, গভীর রাতে মায়ের ঘরে যদি কেউ কোনো অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় তবে নিশ্চয়ই সন্তানের মনে সন্দেহের রেখাপাত হবেই...... দোষ কি নূরের, সব দোষ তার স্বামীর। কেন সে রাতের অন্ধকারে চোরের মত আসে তার কাছে...... কেন সে সাক্ষাতে নিজের অধিকার নিয়ে নিজের বাড়িতে নিজের স্ত্রী-পুত্রের পাশে আসতে পারে না......

......কেন পারি না তাকি তুমি জানোনা মনিরা...... এ যে তার স্বামীর কণ্ঠস্বর.........চমকে উঠে মনিরা, অস্ফুট কণ্ঠে বলে...কে––কে?

কই, কেউ তো নেই––নির্জন কক্ষে মনিরা শুধু একা। টেবিলে টেলিফোনটার দিকে তাকালো সে। নূর যেমনিটি রেখে গেছে তেমনি রয়েছে। কে তবে এত রাতে ফোন করেছিলো? নিশ্চয়ই সে ই......মনিরা এগিয়ে যায় টেবিলের দিকে, তুলে নেয় রিসিভারটা হাতে,. আবার রেখে দেয় টেবিলে। মাঝের দরজা খোলা।

মনিরা ধীর পদক্ষেপে নূরের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। নূর বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা ঘুমায়নি।

মনিরা ওর পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকে—নূর, বাবা নূর!

নূর ঘুমাতে পারেনি তখনও, কারণ তার কচি মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিলো, এত রাতে কে তার মায়ের কাছে ফোন করেছিলো, কোন্ সাহসে সে মাকে ফোন করলো, মাকে তবে সে নিশ্চয়ই চেনে, নাহলে মায়ের নাম ধরে সে কথা বলতো না...

হঠাৎ মায়ের ডাকে চমকে উঠে নূর।

কথা না বলে পারে না সে, বলে—আমাকে ডাকছো?

হাঁ বাবা। ওরে জানিস্ না এত রাতে কে আমার কাছে ফোন করবে, নিশ্চয়ই তোর আব্বু ফোন করে থাকবেন।

আব্বু! আব্বু যে কোথায় গেছেন তুমি বলেছিলে?

হয়তো এসেছেন। এসেই খেয়ালমত ফোন করেছিলেন। হাঁরে নূর, কি বললেন তিনি?

মায়ের কথায় নূরের রাগ অনেকটা পড়ে এগেছে। সে বুঝতে পারে ঠিক তার আব্বুর গলার স্বরের মতই মনে হয়েছিলো প্রথম কিন্তু আব্বু যে দেশে নেই এজন্যই নূর ভাবতে পারেনি তার আব্বুর গলা সেটা। বলে নূর—আম্মি আমাকে মাফ করে দাও, কারণ আমি বুঝতে পারিনি সেটা আব্বুর গলা। আম্মি, তুমি রাগ করেছো ভেবে আব্বু, অনুরোধ জানাচ্ছিলেন আমি তোমাকে ডেকে না দিয়ে ভুল করেছি। আমাকে মাফ করে দাও আম্মি!

মনিরা নূরকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

মনিরার দু'গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু নূরের মাথায়।

নূর বললো—আম্মি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমি না বুঝে তোমাকে যা বলেছি ভুল করেছি।

মনিরা পুত্রের কথায় কোনো জবাব দিতে পারে না, নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলে। কত ব্যাথা, কত কথা তার বুকে জমা হয়ে আছে যা সে কাউকে বলতেও পারে না, জানাতেও পারে না।

মায়ের কোলে মাথা রেখে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে নূর।

❑

সরকার চাচা, একটা কথা বলবো। মনিরা এসে দাঁড়ালো বৃদ্ধ সরকার সাহেবের পাশে।

সরকার সাহেব হিসেব নিকেশ লিখছিলেন, তিনি চশমার ফাঁকে চোখ তুলে তাকালেন—বলো মা কি কথা?

মনিরা সরকার সাহেবের পাশে বসে পড়লো, তারপর বললো—সরকার চাচা, নূর বেশ বড় হয়েছে, এখন সে অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। কেউ কিছু বললে সে তার মানে বুঝে। সরকার চাচা, ভয় হয় হঠাৎ কেউ কোনো কথা ওকে বলে বসে। ওর আব্বু সম্বন্ধে ও কিছু জানুক এটা ওর আব্বু চায় না।

জানি মা জানি। এ ব্যাপারে আমি নিজেও ভাবি কিন্তু কি করা যায় বলো?

একমাত্র উপায় ওকে বিদেশে পাঠানো।

হাঁ, বিদেশে পাঠানো ব্যাপার নিয়েই আমি অনেকদিন থেকে চেষ্টায় আছি। ভেবেছিলাম প্রবেশিকা পরীক্ষার পর পাঠালে ভাল হতো।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করা যায় না, কারণ অন্যান্য ছেলের চেয়ে নূর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কাজেই ওকে এই বয়সেই বিদেশ পাঠাতে হবে।

তা মন্দ হয় না। কাজী সাহবের ছেলেটার বয়স আট কিংবা নয় হবে, তাকেও এবার কাজী সাহেব আমেরিকায় পাঠাবেন মনস্থ করেছেন।

মনিরা বললো—হাঁ, আমিও শুনেছি সে কথা। সরকার চাচা, নূরকেও আমি এ বছরেই বিদেশ পাঠাবো, আপনি সব ব্যবস্থা করুন।

মনিরকে এ ব্যাপারে বলেছিলে মা?

হাঁ, সে প্রথমে রাজি হয়নি কিন্তু পরে রাজি হয়েছে। প্রথম বলেছিলো বয়স হোক বিদেশে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিও। সরকার চাচা, ওকে বিদেশ পাঠাতে আমার যে কত কষ্ট হবে আপনি তা বুঝবেন না।

জানি মা সব বুঝি কিন্তু না পাঠিয়ে তো কোনো উপায় নেই।

আঁচলে চোখ মুছে মনিরা—সরকার চাচা, আপনি সব ব্যবস্থা করুন।

আচ্ছা মা আচ্ছা।

মনিরা চলে যায়।

মরিয়ম বেগম আড়াল থেকে এতক্ষণ সরকার সাহেব আর মনিরার কথাবার্তা সব শুনছিলেন। মনিরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাবার পর মরিয়ম বেগমও উঠে এলেন উপরে।

মনিরা তখন নূরের ফটোখানা হাতে তুলে নিয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, তার দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা।

মরিয়ম বেগম এসে দাঁড়ালেন পাশে, ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন—ছেলেকে দূরে পাঠাতে কার মন চায় বলো? সবাই চায় সন্তান সব সময় কাছে কাছে থাক......

মনিরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে, তারপর মরিয়ম বেগমকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে—মামীমা, তাই বলে এতটুকু ছেলে কে কবে বিদেশ পাঠায় বলো? যারা পাঠায় তাদের ঘরে আরও দু'একজন আছে। বলো, বলো, মামীমা আমি ওকে দূরে পাঠিয়ে কাকে নিয়ে থাকবো?

মরিয়ম বেগমেরও খুব কষ্ট হচ্ছিলো, এতবড় বাড়িখানা শুধু একমাত্র নূর যেন ভরে রাখে সর্বক্ষণ। হৈ চৈ আর ছুটোছুটি, দুষ্টামিতে সরগরম থাকে বাড়িটা, সব সময় চাকর বাকর সবাই তটস্থ হয়ে থাকে নূরের দাপটে। সেই নূর বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে সমস্ত বাড়িখানা একেবারে ঝিমিয়ে পড়বে। মরিয়ম বেগম পুত্রবধুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও কেঁদে ফেলেন!

❑

কান্দাই শহর ছেড়ে কয়েক মাইল দূরে সরাইখানাটি। খুব বড়সড় না হলেও একেবারে ছোট নয়। সরাইখানার সম্মুখে কয়েকটা ঝামগাছ এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঝাম গাছের নিচে একটা মাচা। ঠিক বাঁশের তৈরি নয়, শাল কিংবা সেগুন কাঠের তক্তায় তৈরি মাচাটি।

খর দুপুরে কতকগুলো লোক এখানে বসে বসে খোশগল্প করে, বিড়ি-তামাক খায়। কত আজগুবি কাহিনীই না ওরা সৃষ্টি করে এখানে বসে দিনের পর দিন।

অন্যান্য দিনের মত আজও অনেকগুলো লোক বসে হাসি-গল্প- তামাশা করছিলো। এমন সময় একটি অর্ধপাগল লোক এসে দাঁড়ায় সেখানে। লোকটির শরীরে ছোড়া জীর্ণ জামা-পাজামা, মাথায় পাগড়ী, গায়ে একজোড়া শত তালিযুক্ত নাগ্‌রা জুতা।

লোকটা এসে দাঁড়িয়ে নামায় বসা একজনকে লক্ষ্য করে বললো—ভাই, আমাকে একটা সিগারেট দেবে......... একটা সিগারেট! আমি তোমায় একটি মোহর দেবো, সোনার মোহর বুঝলে?

প্রথমে ওর কথা কেউ কানে না নিলেও একটু পরে মাচায় বসা সবার দৃষ্টি এসে পড়লো ওর উপর। বিশেষ করে মোহরের কথা যখন তাদের কানে গিয়ে পৌছলো তখন তারা সবাই ঘিরে ধরলো পাগলটাকে। বললো একজন—সিগারেট দেবো কত সিগারেট নেবে! কই, মোহর কই দেখি?

পাগলটা মোহর বের করে দেখালো—এই দেখো, এটা দেবো।

সবাই অবাক হয়ে দেখলো—পাগলের হাতে একটা সোনার মোহর ঝক্‌মক্ করছে।

ওকে তাড়াতাড়ি মাচায় বসিয়ে কেউ মাথা, কেউ পিঠ, কেউবা পা নাড়তে শুরু করে দিলো। সকলের ইচ্ছা মোহরটা নেয়।

পাগল কিন্তু সহজে মোহরটা হাতে দিচ্ছে না কারও। সে মোহরটা বারবার নিজের চোখের সম্মুখে ধরে দেখছে, কখনও বা ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে ধুলোর মধ্যে, আবার কুড়িয়ে তুলে নিচ্ছে।

মাচায় বসা লোকগুলোর চোখ মোহরের লোভে চকচক করছে। সবাই সিগারেট বের করে মেলে ধরছে ওর সামনে— নাও......

পাগল একজনের হাত থেকে তুলে নিলো একটি সিগারেট এবং তাকে মোহরটি দিয়ে দিলো।

খুশিতে লোকটা আত্মহারা, একটি সিগারেটের পরিবর্তে একটি মোহর পেলো কম কথা নয়!

একি, পাগল একটির পর একটি মোহর বের করে চলেছে!

সকলের চোখ তখন বিস্ময়ে ছানাবড়া হবার উপক্রম । একজন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো সে সকলের অজ্ঞাতে সরে পড়লো। এসে হাজির হলো সরাইখানায়। মালিকের কানে মুখ নিয়ে কিছু বললো, তারপর উভয়ে চলে গেলো ভিতরে।

একটি সরু সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো সরাইখানার মালিক ও সেই লোকটি নিচে। মাটির তলায় একটি বিরাট কক্ষ।

কক্ষমধ্যে তীব্র আলো জ্বলছে।

কক্ষের মাঝখানে একটি লৌহ চেয়ারে উপবিষ্ট স্বয়ং ইমরান। তার চারপাশে ঘিরে বসে আছে চল্লিশটি কুকুর।

ইমরানের সম্মুখে একটি রেকাবিতে স্তূপাকৃত মাংস রয়েছে। ইমরান সেই মাংস থেকে এক এক টুকরা মাংস নিয়ে ছুড়ে দিচ্ছে এক একটি কুকুরের মুখে।

ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো মাংসের টুকরাগুলো লুফে নিচ্ছে সুকৌশলে। কিন্তু যে পাচ্ছে না সে অদ্ভুত এবং হিংস্র শব্দ করছে।

এমন সময় একটি লোককে হাত পিছমোড়া বাঁধা অবস্থায় নিয়ে এলো সেখানে। লোকটার দেহ চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত, চোখ দুটো

কোঠরাগত, চুল এলোমেলো রুক্ষ। লোকটিকে দু'জন বলিষ্ঠ লোক টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলো সেখানে।

লোকটা নীরব।

তার চোখ দুটোতে করুণ ভাব ফুটে উঠলেও মুখমণ্ডলে একটা বলিষ্ঠতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিলো।

লোকটাকে জোরপূর্বক এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো ইমরানের সম্মুখে। ইমরানের হাতে একটা জমকালো চাবুক। চাবকুটা উজ্জ্বল আলোতে চক্‌চক্ করছে। কুকরগুলো লম্বা জিভ বের করে হাঁপাচ্ছিলো এবং সম্মুখের সংসারের রেকাবির দিকে তাকাচ্ছিলো।

ইমরান আলী লোকটাকে লক্ষ করে দাঁতে দাঁত পিষে বললো—বদমাইশ, এখনও তোমার স্পর্ধা কমেনি? তুমি আমাদের কাজে বাধ সাধতে এসেছিলে! জানো আমি কে?

লোকটি নীরব, কোনো কথা সে বলে না, কোনো শব্দ সে উচ্চারণ করে না।

ইমরান বলে উঠে আবার—পুলিশের চাকরি করতে কিন্তু এ কথা জানতে না আমরা পুলিশের বাবা। যেভাবে আমরা পুলিশমহলকে নির্দেশ দেবো সেইভাবে পুলিশ কাজ করবে? দেশের যারা অধীশ্বর তাঁরাই হলেন আমাদের ব্যবসার অংশীদার, বুঝলে?

লোকটা পুলিশ ইন্সপেক্টার মোহাম্মদ আলী কাওসারী। বড় ভাল এবং নীতিপরায়ণ ব্যক্তি তিনি। দেশের চোরাচালানীদের নির্মূল অভিযানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কান্দাই সীমান্তে তিনি কাজ করে যাচ্ছিলেন। যাতে কোনো চোরাকারবারী দেশের পুলিশ প্রধানের অনুমতি নিয়ে সীমান্তে কড়া পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন।

দক্ষ ইন্সপেক্টার কাওসারীর সতর্কতার দরুন চোরাকারবারী মুনাফাকারী দল ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলো। এতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বেশ কয়েকজন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁরা তাদের ভাড়াটে গুন্ডাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, কাওসারী সাহেবকে সরিয়ে ফেলো। শুধু কাওসারী নয়, তাঁকে যে

সমস্ত পুলিশের লোক সহায়তা করে চলেছে তাদেরকেও এক এক করে হটিয়ে দাও পৃথিবী থেকে।

ইমরান আলী হিম্মৎ খাঁর দলেরই একজন ছিলো। এখনও সে চোরাচালানী ব্যবসায়ীদের দলেই আছে এবং সে না হলে কান্দাই চোরাচালানীদের একেবারে চলে না।

কান্দাই শহরের সভ্য সমাজের কেউ ইমরান আলী সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকলেও শহরের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিই ইমরানের সহযোগিতায় ধন্য। ইমরান আলী তাঁদের ভাড়াটে বন্ধু। ইমরান শুধু একা নয়, তার হাতে রয়েছে অমন জাঁদরেল পাঁচশত গুন্ডা।

দেশের জনগণ এদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত কিন্তু কেউ এদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না, কারণ এদের হাতে রয়েছে অস্ত্র। এদের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনোরকম উক্তি উচ্চারণ করে তবেই হয়েছে, মৃত্যু তাদের অনিবার্য। এক সময় হাইজ্যাক হয়ে যাবে সেই ব্যক্তি। কোথায় কে তাকে উধাও করলো কেউ বুঝতেও পারবে না। দু'চার দশ দিন পর দেখা যাবে হয়তো কোনো পথের ধারে কিংবা কোনো জঙ্গলে অথবা কোনো ডোবায় সেই নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মস্তকহীন দেহটা পড়ে আছে অথবা ভাসছে।

মৃতদেহ সনাক্ত হয়তো হলো কিন্তু সে খুনের কোনো হদিস মিললো না। পুলিশমহলের যতটুকু কর্তব্য তারা পালন করে বটে, আর তার বেশি কেই বা করবে বেচারী পুলিশবাহিনী। লাশটা পোষ্ট মর্টেম করা হয় তারপর একটা ডায়রী হয়তো করা হলো, তারপর ধীরে ধীরে মুছে গেলো সে খুনের কাহিনী। এমনি কত শত জীবন প্রদীপ প্রতিদিন নিভে যাচ্ছে কে তার হিসেব রাখে।

ইমরান এই হত্যাকারীদের নির্দেশদাতাই শুধু নয়, তাদের পথ প্রদর্শক।

প্রতিদিন ইমরানের হাতে কত জীবন যে ধ্বংস হচ্ছে তার হিসেব নেই। আজকাল শুধু অস্ত্র দ্বারাই সে হত্যালীলা সংঘটিত করে না, সে একদল ক্ষুধার্ত কুকুরের দ্বারা নরহত্যা চালায়। কখনও কারও চোখ উপড়িয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয় কুকুরের ঝাঁকের মধ্যে।

কুকুরগুলো যেন ইমরানের দাস, সে শিকার ছেড়ে দিয়ে ইংগিত করতেই কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শিকারটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ভক্ষণ করতে শুরু করে।

যে মুহূর্তে অসহায় মানুষটির উপর একঝাঁক কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তার করুণ তীব্র আর্তনাদে ভরে উঠে সরাইখানার মাটির নিচের কক্ষটি। কেউ শুনবার নেই, কেউ এগুতে আসে না, পাষাণ দেয়ালে আঘাত খেয়ে প্রতিধ্বনি জাগে সে আর্তনাদের।

কাওসারী তাকায় ইমরানের দিকে, করুণ অসহায় চোখ।

ইমরান বুট সহ পা মাটিতে আঘাত করে কঠিনভাবে বলে— তোমার কাজের উপযুক্ত শাস্তি আজ পাবে। এসেছিলে আমাদের কাজে বাধা দিতে। বাছাধন জানোনা, চেনো না আমরা কারা? আমরাই হলাম দেশের সবকিছু, আমাদের অংগুলি হেলনে পুলিশমহল নাচের পুতুল বনে আছে আর তুমি...ইমরান কুকুরগুলো কাওসারীর উপর লেলিয়ে দেবার পূর্বে তার পাশে দন্ডায়মান ব্যক্তিদ্বয়কে বলে—এবার নিয়ে এসো মিস দিপালীকে, যাও—

ওরা চলে যায়।

ইমরান কুকুরগুলোর দিক একটি একটি মাংসখণ্ড ছুঁড়ে দেয় কিন্তু সম্পূর্ণ মাংস খেতে দেয় না। সামান্য মাংস ভক্ষণে ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো আরও হিংস্র হয়ে উঠে।

এমন সময় সরাইখানার মালিকসহ সেই ব্যক্তি এসে হাজির হয়, যে ব্যক্তি ঐ পাগলের হাতে মোহরগুলো দেখেছিলো।

ইমরানের কানে মুখ নিয়ে কিছু বলে সরাইখানার মালিক।

সঙ্গে সঙ্গে ইমরানের চোখ দুটো জ্বলে উঠে হিংস্র শার্দুলের মত। সে সরাইখানার মালিকের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললো—পাগলের কাছে মোহর?

হাঁ, আমি নিজে দেখে এলাম—একটি নয় দু'টি নয় বেশ কয়েকটি।

যাও বিলম্ব করো না, ওকে যেমন করে হোক নিয়ে এসো আমার সম্মুখে।

বেরিয়ে যায় লোকটা।

সরাইখানার মালিক দাঁড়িয়ে থাকে তার পাশে। লোকটা চলে যেতেই বলে ইমরান—তিসিজা, নিশ্চয়ই ও পাগল কোনো ধনকুবের হবে। ওকে কৌশলে হাত করতে পারলে হয়তো ওর ধনভান্ডারের নাগাল পাবো আমরা।

ঠিক বলেছো ইমরান, নাহলে পাগলের হাতের মুঠায় মোহর আসবে কোথা থেকে।

ততক্ষণে দিপালীকে নিয়ে হাজির হয় ইমরানের অনুচরটি। দিপালীর হাত দু'খানা এখন খোলা অবস্থায় রয়েছে। সমস্ত শরীরে ক্ষতচিহ্ন, চুলগুলো এলোমেলো বিক্ষিপ্ত, ছিন্ন বসন ছিন্ন জামা দিয়ে দিপালীর দেহের কিছু কিছু অংশ নজরে পড়ছে।

দিপালী এসে দাঁড়াতেই ইমরান তাকে লক্ষ্য করে বললো— এই দেখো তোমার সাথী!

চমকে উঠলো দিপালী ওপাশে দন্ডায়মান পুলিশ ইন্সপেক্টার কাওসারীর দিকে তাকিয়ে। অর্ধ বয়সী ভদ্রলোকটির যে অবস্থা তার চোখে পড়লো তাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলো। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থিরনয়নে তাকিয়ে রইলো দিপালী তার দিকে। যদিও দিপালী তাকে চিনতে পারলো না তবু বুঝতে পারলো কোনো মহান ব্যক্তিই হবে, যার অবস্থা এই মুহূর্তে তারই মত।

ভদ্রলোককে বড় করুণ অসহায় মনে হলো দিপালীর কাছে। তাঁর হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। কপালের একটি ক্ষত স্থান থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত দেহে চাবুকের আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান।

দিপালী কাওসারী সাহেবের দিকে কিছুক্ষণ একনজরে দেখে নিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ইমরানের দিকে। সে দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছিলো ঘৃণা আর তিক্ততার ছাপ।

ইমরান আলী ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বললো—এও তোমার মত এক বিশ্বাসঘাতক! দিপালী, যদি জীবনে বাঁচতে চাও তবে এখনও আমাদের কাজে সহায়তা করবে বলে রাজি হয়ে যাও, নইলে......আংগুল দিয়ে

কাওসারী সাহেবকে দেখিয়ে বলে ইমরান—নইলে এর মত তোমাকেও জীবন্ত অবস্থায় কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

চমকে উঠলো আবার দিপালী, ভয়-বিহ্বলভাবে তাকালো সে একবার কাওসারী সাহেব এবং পরে ইমরানের মুখের দিকে।

ইমরান ঐ মুহূর্তে কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে শিস দিলো, সঙ্গে সঙ্গে কাওসারী সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো কুকুরগুলোর মধ্যে।

কুকুরগুলো ইমরানের শিস শোনামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়লো কাওসারী সাহেবের দেহের উপর। কাওসারী সাহেব তীব্র আর্তনাদ করে পড়ে গেলেন মেঝেতে।

দিপালী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

কুকুরগুলো দিপালীর অতি পরিচিত, সে কোনো সময় ভাবতে পারেনি কুকুরগুলো এত হৃদয়হীন। ইমরান আলী যেমন জীবন্ত শয়তান, তেমনি কুকুরগুলো এক একটি জীবন্ত আজরাইলের মত কাওসারী সাহেবের মাংস টেনে ছিড়ে খেতে লাগলো।

এ দৃশ্য সহ্য করার মত অবস্থা দিপালীর ছিলো না, সে দু'হাতে চোখ ঢেকে ছুটে পালাতে যাচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে ইমরানের দু'জন অনুচর তাকে ধরে ফেলে দু'দিক থেকে, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে ইমরানের পাশে।

ইমরান তখন জোরপূর্বক দিপালীর চোখ থেকে হাত দু'খানা সরিয়ে নিয়ে বলে— দেখো দিপালী, তোমারও এই অবস্থা হবে যদি তুমি আমাদের কথামত না চলো। এইসব ক্ষুধার্ত কুকুর জীবন্ত অবস্থায় তোমার দেহের মাংস ছিঁড়ে খাবে...

কাওসারী সাহেবকে ততক্ষণে কুকুরগুলো ছিঁড়ে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে। একটা কুকুর তাঁর গলা কামড়ে টুঁটি ছিড়ে ফেললো। কাওসারী সাহেব হাত-পা আছড়ে এবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। নীরব অসার হয়ে গেলো তাঁর দেহটা।

দিপালী উন্মাদিনীর মত হাউমাউ করে কাঁদছে। যদিও সে কাওসারী সাহেবকে চিনতো না তবু সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো তার শেষ পরিণতির তীব্র কষ্ট আর মৃত্যু যন্ত্রণাকে।

ঐ মুহূর্তে সেই লোকটি পাগলটাকে সঙ্গে করে প্রবেশ করলো সেখানে।

পাগল কক্ষে প্রবেশ করেই আঁতকে উঠলো কক্ষমধ্যের দৃশ্য লক্ষ্য করে। মেঝেতে ক্ষতবিক্ষত একটি মৃতদেহ কতগুলো কুকুর ঘিরে ধরে ভক্ষণ করছে। রক্তে মেঝেটা একেবারে লালে লাল হয়ে গেছে যেন।

পাগল কিছুক্ষণ হতভম্বের মত আরষ্টভাবে তাকিয়ে এ দৃশ্য লক্ষ্য করলো, তারপর ধীরে ধীরে চোখ ফেরালো ইমরানের দিকে।

ইমরান বললো—কি হে, অমন করে কি দেখছো।

কোন জবাব দিলো না পাগল, হঠাৎ সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো—হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ...

দিপালী এতক্ষণ দু'হাতে কঠিনভাবে মুখ ঢেকে রেখেছিলো হঠাৎ হাসির শব্দ কানে যেতেই চোখ থেকে ধীরে ধীরে হাত দু'খানা সরিয়ে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো দিপালী—রাজকুমার আপনি...ঝাঁপিয়ে পড়লো সে পাগলের বুকে।

ইমরান প্রথমে বিস্মিত হলো।

ইমরানের সঙ্গী যারা ঐ কক্ষ মধ্যে ছিলো সবাই হতভম্ব হয়ে গেলো যেন। অবশ্য সামান্য ক্ষণের জন্য। দিপালী যে পাগলটাকে চিনতে পারবে ভাবতেও পারেনি ওরা কেউ। ইমরান ও তার দলবল অবশ্য অনুমান করেছিলো পাগল সাধারণ লোক নয়, সে নিশ্চয়ই কোনো ধনকুবের হবে। দিপালী যখন রাজকুমার বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে তখন তাদের সন্দেহ যেন সত্যে পরিণত হলো। হাঁ, ঠিকই ধরেছিলো তারা পাগল কোনো রাজকুমারই হবে।

ইমরান দিপালীকে পাগলের বুক থেকে সরিয়ে নিলো না বা কাউকে সরিয়ে নিতে বললো না। দিপালী পাগলের জামা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলেছে।

পাগল নীরব। তার চোখেমুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। মাঝে মাঝে সে ঐ মেঝের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটার দিকে তাকাচ্ছে, তারপর ইমরানের মুখে।

দিপালী চোখ তুললো, তারপর পাগলের মুখে বুকে গলায় হাত বুলিয়ে বললো—রাজকুমার আপনার, এই দশা হয়েছে! একি হয়েছেন আপনি!

রাজকুমার! কে তোমার রাজকুমার? কেই বা তুমি! সরে যাও, সরে যাও বলছি...পাগল দিপালীকে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

দিপালী তবু ওকে আঁকড়ে ধরে থাকে—না না আপনি আমাকে সরিয়ে দেবেন না রাজকুমার। কতদিন থেকে আমি আপনার প্রতীক্ষায় আছি। জানতাম আপনি একদিন আসবেন।

হাঃ হাঃ হাঃ জানতে? জানতে আমি আসবো, আমি আসবো?

জানতাম রাজকুমার, আমি জানতাম।

কে রাজকুমার? আমি তো সাধারণ একটি মানুষ।

না, তুমি সাধারণ মানুষ নও। তুমি—তুমি—

ইমরান ঐ সময় উঠে এলো দিপালীর পাশে। দিপালীর পিঠে হাত রেখে বললো—বলো, বলো দিপালী, কে... কে এই পাগল? বলো—বলো?

দিপালী বলে উঠে—রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে তোমরা চেনো না?

রাজকুমার জ্যোতির্ময়! অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো ইমরান আলী।

হাঁ হাঁ তিনিই আজ পাগল...বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো দিপালী।

ইমরান এবং তার দলবল সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো। ইমরান বললো—চান্দু ওকে নিয়ে যাও। গোসল করিয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরিয়ে দাও। রাজকুমার জ্যোতির্ময় আমাদের অতিথি।

পাগল বলে উঠে—না না, আমি রাজ কুমার জ্যোতির্ময় নই তুমি ভুল করছো। আমাকে একটা সিগারেট দেবে, আমি মোহর দেবো।

ইমরানের চোখ দুটো ঝকমক করে উঠলো। বললো সে—সিগারেট নেবে? এই নাও, পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলো সে পাগলটার দিকে।

পাগল একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে পকেট হাতড়ে বের করলো একটি মোহর, বললো—এই নাও,

ইমরান দ্রুত হাতে মোহরটা থাবা দিয়ে তুলে নিলো পাগলের হাতে থেকে। তারপর চোখের সামনে ধরে এপিঠ ওপিঠ উল্টেপাল্টে দেখে বললো—এ মোহর তুমি কোথায় পেলে?

পাগল সিগারেটটা ঠোটের ফাঁক থেকে আংগুলে নিয়ে বললো—আমার অমন মোহর অনেক—অনেক আছে। তুমি আরও নেবে?

হাঁ, তোমাকে অনেক সিগারেট দেবো।

সত্যি দেবে তো?

হাঁ, সত্যি দেবো। চান্দু নিয়ে যাও যেন ওর যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়।

চান্দু নামক লোকটা পাগলের হাত ধরে বললো—চলো আমার সঙ্গে।

দিপালী পাগলের জামার আস্তিন চেপে ধরে—না, ওকে আমি যেতে দেবো না। আমার রাজ কুমারকে আমি পেয়েছি...

ইমরান দিপালীর হাত ছাড়িয়ে নেয় জোরপূর্বক, তারপর বলে—যও নিয়ে যাও চান্দু।

চান্দু পাগলা সহ চলে যায়।

ইমরান বলে—দিপালী, এতদিন তুমি আমাদের কাজে কোনো সহায়তা না করার জন্য আমরা তোমার প্রতি অনেক অত্যাচার-অনাচার করেছি। এবার তোমার প্রতি আমরা কোনো অনাচার বা অত্যাচার করবো না।

দিপালী দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। ইমরানকে কোনো সময় এমনভাবে মিষ্ট ভাষায় কথা বলতে সে শোনেনি। অবাক হয়ে গেছে দিপালী জীবন্ত শয়তানটার স্বর পাল্টে যাওয়ায়।

ইমরান বলে চলেছে...কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। মন্দ কাজ নয়, রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে সেবা যত্নে আরোগ্য করে তুলতে হবে। বলো পারবে?

দিপালীর চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করে উঠলো, বললো সে—পারবো! আমার রাজকুমারকে আমি সারিয়ে তুলতে পারবো।

বেশ, তাহলে তুমি তোমার রাজকুমারকেও পাচ্ছো আর পাচ্ছো অনাবিল শান্তি। আমরা তোমার উপর আর কোনো অত্যাচার করবো না।

সত্যি বলছো?

হাঁ, সত্যি। ইমরান সরাইখানার মালিকের কানে মুখ নিয়ে কিছু বললো, তারপর অপর একজন অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো সে—নিয়ে যাও একে।

দিপালী সহ লোকটা বেরিয়ে গেলো।

দিপালী কক্ষ ত্যাগ করবার সময় একবার ভূতলে লুন্ঠিত কাওসারী সাহেবের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটার দিকে করুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো, তাকালো ইমরানের মুখে তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো।

❑

মিঃ জাফরীর ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। তিনি চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললেন—মিঃ হারুন আজও আপনি মিঃ কাওসারীর কোনো সন্ধান পেলেন না?

না স্যার।

জানি না ভদ্রলোক কোথায় গেলেন। এভাবে তিনি উধাও হবেন ভাবতে পারিনি আমরা।

স্যার, পুলিশমহল মিঃ কাওসারীর ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রয়েছেন। তিনি কেমনভাবে কোথা থেকে নিরুদ্দেশ হলেন কেউ জানে না।

হাঁ, বড় অদ্ভুত ব্যাপার। বললেন পুলিশ ইন্সপেক্টর হারেজ রিজভী।

সমস্ত পুলিশ অফিসে একটা বিষাদভরা ভাব বিরাজ করছে। পুলিশমহল চষে ফেলছে সমস্ত কান্দাই শহর কিন্তু কোথাও মিঃ কাওসারীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

শুধু পুলিশমহল নয়, গোয়েন্দা বিভাগ পর্যন্ত তৎপর হয়ে সন্ধান চালিয়ে বিফল হয়েছেন এ ব্যাপারে। শুধু কাওসারী নয় পর পর আরও কয়েকজন পুলিশের লোক নিখোঁজ হয়েছেন কাওসারী সাহেবের অন্তর্ধানের পরে। পুলিশমহল গভীরভাবে চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এইসব পুলিশের লোককে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান মাল উদ্ধার এবং গ্রেপ্তারের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলো।

মিঃ কাওসারী অবশ্য স্বেচ্ছায় গিয়েছিলেন। দেশের সম্পদ যেন বিদেশে পাচার হয়ে না যায়। এই ব্যাপারে তিনি উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কর্মস্থান থেকে তিনি নিখোঁজ হলেন একরকম বিস্ময়করভাবেই।

মিঃ হারুন ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বললেন—স্যার, মিঃ কাওসারী দেশের উন্নতি কামনা করেছিলেন তাই তাঁর ভাগ্যাকাশ আজ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো। শুধু মিঃ কাওসারী নন, তাঁকে যারা সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদেরও কয়েকজন নিখোঁজ এবং নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

মিঃ জাফরী বললেন—মিঃ কাওসারীর নিরুদ্দেশ অত্যন্ত রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

এতক্ষণ মিঃ ইলিয়াস গম্ভীর মুখে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন—এর পিছনে কোনো অদৃশ্য হাতের ইংগিত রয়েছে।

হাঁ আমারও তাই মনে হয়। বললেন মিঃ জাফরী।

মিঃ কাওসারী সাহেবকে নিয়ে পুলিশ অফিসে চলেছে নানা রকম আলাপ-আলোচনা। বহু সন্ধান করেও মিঃ কাওসারীকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু পর পর দু'জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিলো কান্দাই শহরে কোনো জঙ্গলের পাশে। প্রত্যেকটা মৃতদেহের দেহ ছিলো ক্ষতবিক্ষত, কোনোটির চোখ অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কোনোটি ছিলো মস্তকবিহীন।

মিঃ কাওসারীর কি অবস্থা হয়েছে কেউ জানে না।

গভীর রাত।

ইমরান আলীর চারপাশ ঘিরে বসে আছে তার সহচরগণ। কান্দাই থেকে এসেছে রশিদ হায়দার। জাহানারা বলে যে তরুণীটিকে সে বন্দী করে রেখেছিলো, তাকে সঙ্গে এনেছে সে।

সেদিন মিঃ কাওসারীকে হত্যা করা হয়েছে, এ ব্যাপার নিয়েই তাদের মধ্যে গোপন কোনো শলা-পরামর্শ হচ্ছিলো।

এমন সময় একজন অনুচর এসে বললো—মালিক, পাগলকে কিছুতেই ভাল জামা-কাপড় পরানো যাচ্ছে না।

হায়দার আলী বললো—পাগল, কে পাগল?

আপনি চিনতে পারবেন না, সম্পূর্ণ অজানা এক পাগল এসে হাজির হয়েছে। অবশ্য আমাদের এখানে সে আসেনি। পথ থেকে তাকে ধরে আনা হয়েছে। কথাগুলো বললো ইমরান আলী।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললো হায়দার—পাগলকে পথ থেকে ধরে আনা হয়েছে, ব্যাপারটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে।

হায়দার সাহেব, আপনি বুঝবেন না এটা সাধারণ পাগল নয়, রাজকুমার জ্যোতির্ময়। যার কাছে আছে শত শত স্বর্ণ মোহর......

রাজকুমার জ্যোতির্ময়?

হাঁ, হিম্মৎ খাঁর কান্তা বারে যার সঙ্গে দিপালীর ভাব ছিলো।

হায়দার বললো—মনে পড়েছে কান্তাবারে রাজকুমার জ্যোতির্ময় যেতো কিন্তু শেষে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বললো ইমরান—দস্যু বনহুর যখন হামলা চালিয়ে হিম্মৎ খাঁ ও তার দলবলকে হত্যা করে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হিলালী সহ মিস দিপালীকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলো তখন রাজকুমার জ্যোতির্ময় মিস দিপালীকে না পেয়ে পাগল হয়ে যায়।

ঠিক বলেছো ইমরান, দিপালীর জন্যই জ্যোতির্ময় আজ পাগল বনে গেছে। দিপালীর সংবাদ কি বলোনি তো?

বলবো কিন্তু একসঙ্গে তো সব কথা বলা যায় না। দিপালী এখনও আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেনি।

বলো কি ইমরান?

হাঁ হায়দার আলী সাহেব, আমি বহু চেষ্টা করেও তাকে পারিনি আয়ত্তে আনতে। পুলিশ ইন্সপেক্টার কাওসারীসহ যে সাতজন পুলিশ কর্মচারীকে আমরা কান্দাই সীমান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিপালীর চোখের সম্মুখে জীবন্ত অবস্থায় কুকুর দিয়ে হত্যা করেছি তবু দিপালীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। আজ তারই সম্মুখে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ কাওসারীকে কুকুরের মুখে নিক্ষেপ করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি তোমার অবস্থাও এক সময় এমনি হবে।

তবু সে আমাদের কাজে সহায়তা করতে সম্মত হয়নি?

হায়দার আলী সাহেব আমি কথা দিয়েছিলাম তাকে যেমন করে হোক বাগে আনবো।

কই, তোমার কথা রক্ষা করতে পারলে কই?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কেমন করে ওকে আয়ত্তে আনতে হয় জানি। আজ নুতন আরেক জাল ফেলেছি। অবশ্য সেটা আমার কৌশল নয়, কৌশলটা এসে গেছে আপনি।

তার মানে?

মানে রাজকুমার জ্যোতির্ময় যদি আজ উন্মাদ হয়ে এখানে এসে না পৌছতো তাহলে হয়তো দিপালীকে কিছুতেই বাগে আনা সম্ভব হতোনা।

ইমরান, তোমার কথাগুলো সব হেঁয়ালিপূর্ণ। ঠিক বুঝতে পারছি না? বললো হায়দার আলী।

অন্যান্য যারা বসেছিলো তারা তখন চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো। তাদের কথাবার্তা।

রশিদ হায়দার আলীর কথায় ইমরান আলী বলে উঠলো— দিপালী রাজকুমারকে দেখেই চিনতে পেরেছিলো এবং তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিলো, আমার রাজকুমার আপনি এসেছেন...আমি আপনাকে কত খুঁজেছি......আপনি আমার জীবন মন প্রাণ......

বুঝলাম কিন্তু কি করে দিপালীকে তুমি নিজেদের আয়ত্তে আনতে চাও?

সব রকম কলা-কৌশল এই মাথায় আছে বুঝলেন......কথাটা বলার সময় ইমরান নিজের মাথায় আংগুল দিয়ে টোকা মেরে দেখিয়ে দেয়।

বলে রশিদ হায়দার—আচ্ছা দেখা যাবে সবকিছু। হাঁ তখন যে বলছিলে জ্যোতির্ময় মানে রাজকুমার নাকি মোহর এনেছে?

হাঁ এবার আমরা দুটো শিকার একসঙ্গে হাতের মুঠায় পেয়েছি। ১নং হলো দিপালী ২নং হলো রাজকুমার জ্যোতির্ময়। রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে আটক রেখে আমরা বহু স্বর্ণমোহর আদায় করতে পারবো আর দিপালীও রাজকুমারকে পেয়ে ধীরে ধীরে পাল্টে যাবে।

এতক্ষণে নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলো লোকটা, সে পাগলের সংবাদ নিয়ে এসেছিলো। এবার সে বলে উঠলো—কি করবো মালিক পাগলটা কিছু খাচ্ছে না এবং পরিষ্কার জামা-কাপড় পরছে না।

ইমরান বললো—দিপালী কোথায় তাকে নিয়ে এসো।

লোকটা চলে যায় এবং একটু পরে দিপালীসহ ফিরে আসে। দিপালীর দৃষ্টি রশিদ হায়দারের উপর পড়তেই শয়তান তার উপর কম নির্যাতন চালায়নি। তাকে সর্বভাবে নিষ্পেষিত করছে সে।

দিপালী ওর দিকে কটমট করে তাকালো।

রশিদ হায়দার হেসে বললো—অমন করে তাকাচ্ছো কেন সুন্দরী। আমাকে সম্ভাষণ জানালে না? এসো এসো আমার কাছে।

রশিদ হায়দার উঠে দিপালীকে আলিঙ্গন করতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নাকে হাতচাপা দিয়ে বলে উঠে—দুর্গন্ধ! ওর গায়ে এতো দুর্গন্ধ কেন?

অনেক দিন গোসল করে না বা কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করে না, তাই হয়তো......

ওকে পরিস্কার জামা-কাপড় পরিয়ে দাও তারপর নিয়ে এসো আমার কাছে। শোনো শরীরে সুগন্ধি কিছু মাখিয়ে দিও।

ইমরান বলে উঠে— দেখুন হায়দার সাহেব, এখন দিপালীর মায়া ত্যাগ করুন, কারণ দিপালী যা চায় না তা করা আমাদের চলবে না।

কেন? ভ্রুঞ্চিত করে বলে হায়দার আলী।

ইমরান বললো—দিপালী যাকে চায় সে এসেছে কাজেই... ইমরান রশিদ হায়দার আলীর কানে মুখ নিয়ে কিছু বললো।

রশিদ হায়দার বললো— বেশ তাই হোক। মিস দিপালী তুমি এখন থেকে রাজকুমার জ্যোতির্ময়কে দেখাশোনা করবে। যাও নিজে স্নান করে পরিস্কার জামা-কাপড় পরে নিয়ে রাজকুমার জ্যোতির্ময়ের পাশে যাও। সে কিছু খাচ্ছে না এবং জামা-কাপড় পরছে না।

ইমরান বললো—মিস দিপালী, আমি বলেছি রাজকুমারকে ভাল করে তুলতে পারলে তোমাকে আমরা মুক্তি দেবো, তাছাড়া তোমার উপর আর আমরা কোনো অত্যাচার অনাচার করবো না। যাও দিপালী, রাজকুমার আজ সমস্ত দিন কিছু খায়নি এবং পরিস্কার জামাকাপড় পরছে না।

দিপালীর বুকটা আনন্দে যেন নেচে উঠলো। এত আনন্দ সে বুঝি জীবনে কোনোদিন উপভোগ করতে সক্ষম হয়নি। দিপালীর মনের আনন্দ তার মুলোভাবে প্রকাশ পায় না অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখে।

লোকটা দিপালীসহ চলে যায়।

হোক রাত গভীর তবু দিপালী স্নানাগারে প্রবেশ করে সুগন্ধি সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে স্নান করে নিলো। কত দিন পর যে সে এমন করে স্নান

করলো, সে নিজেই ঠিক জানে না স্নানাগার থেকে ফিরে আসে সে নিজের কামরায় যেখানে তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

কান্দাই থেকে জাহানারা এসেছে সেও আছে তারই কামরায় প্রথমে জাহানারা দিপালীকে দেখে চিনতেই পারেনি, বড় রোগা হয়ে গেছে দিপালী। সেই সুন্দর ডাগর ডাগর চোখে কালিমা পড়েছে। চুলগুলো পাগলিনীর মত এলোমেলো।

জাহানারার অবস্থাও একদিন এমনি ছিলো। প্রথম প্রথম সেও দিপালীর মত হাঁপিয়ে উঠতো, ঠিকমত গোসল করতো না বা কিছু খেতো না। কিন্তু এখন সে অনেকটা সয়ে উঠছে। তা ছাড়া উপায়ই বা কি আছে।

দিপালীকে এতরাতে গোসল করে পরিস্কার জামাকাপড় পরতে দেখে অবাক হয়ে গেলো জাহানারা। তাছাড়া ওকে যেন আজ বড় আনন্দময় লাগছে।

অবাক হয়ে বললো জাহানারা—একি দিপালী, হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন?

দিপালী চুলগুলো আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো—এখন নয় পরে বলবো জাহানারা আপা।

কিন্তু আমার যে বড় শুনতে ইচ্ছা করছে।

তবে শোনো।

বলো?

ইমরানের নির্দেশ, আজ থেকে সে এবং তারদল বল কেউ আমার উপর কোনোরকম নির্যাতন চালাবে না।

তাই বুঝি তোমার এ আনন্দ?

হাঁ জাহানারা আপা। এতদিন গোসল করিনি শুধু ঐ পাপিষ্ঠদের ভয়ে। নিজকে যত পারতাম অপরিস্কার করে রাখতাম, কারণ আমার দেহের দুর্গন্ধে কেউ আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। আজ যখন জানতে পারলাম ওরা আর আমাকে স্পর্শ করবে না তখন নিজেকে পরিস্কার না করে পারলাম না।

চমৎকার বুদ্ধি তোমার দিপালী বোন। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে জাহানারা—আমি পারিনি তোমার মত হতে তাই আমার রেহাই নেই। ওদের খুশি করার জন্য আমাকে দিনরাত পাপ সাগরে হাবুডুবু খেতে হচ্ছে। জানি না কবে আমি মুক্তি পাবো......

কথা শেষ হয় না, ভিতরে প্রবেশ করে ইমরান এবং রশিদ হায়দার। জাহানারার কথার শেষ অংশ তাদের কানে গিয়েছিলো। বললো রশিদ হায়দার—মুক্তি! মুক্তি পাবে সেদিন যেদিন আমি তোমাকে মুক্তি দেবো......

ইমরান বললো—দিপালী, চমৎকার লাগছে তোমাকে যাও, এবার......

দিপালী ধীর মন্থর গতিতে বেরিয়ে যায়।

ইমরান জাহানারার দিকে হাত বাড়ায়।

রশিদ হায়দার হেসে উঠে হোঃ হোঃ হোঃ...... জাহানারা, দিপালীর ব্যাপার দেখে তুমি খুব অবাক হয়ে গেছো, না? সব আমাদের যাদুর খেল, বুঝলে?